TRIBAL SOCIETY OF BIRBHUM : A SOCIO-ECONOMIC STUDY OF *SANTALS* IN SAINTHIA BLOCK

Bedadyuti Barman

INTRODUCTION

The Scheduled Tribes (STs) population constitutes India's most vulnerable group estimated to be 104 million people (Census 2011). This group has suffered discrimination and exclusion in all its dimensions for centuries. This group has been historically deprived access and entitlements not only to economic rights but also to social needs such as education, health and housing. After attaining independence in 1947, the STs received special attention through the Constitution of India with special provisions in education, employment and political representation. But during the last 65 years of independence, all facilities for them failed to reach the lowest strata of the community. The term *Adivasi* is implied to the tribal people. India with diversified ecological, cultural and linguistic zones have given shelter to more than around five hundred tribal community constituting 08.6per cent of total population. The principal inhabitants of the tribal world of Birbhum are the *Santals*, with a small percentage of other tribes. The *Santals*, however had already been living in Birbhum. They seem to have brought to the district by the Zaminders in the last decade of the 18th century for the purpose of jungle reclamation. They were industrious cultivators and expert wood cutters. Their hard labour had transferred indifferent lands into luxuriant plots. The *Santals*, according to all contemporary accounts were simple, innocent and peaceable people. But they were abysmally poor. Apart from great concentrations of the STs mainly *Santals*, in some villages in the district where entire population belongs to the STs. The *Santals* are the major tribal group in Birbhum district are locally known as *Manjhi*. They like to identify themselves as *Hor* (Man) not *Santal*. In Birbhum district of West Bengal they comprise

Development and Discontents in the Perspective of the Continuing Disadvantaged Position of the Scheduled Castes. (A Case Study of the Rajbanshis in Jalpaiguri District, W.B.)

Bedadyuti Barman[1]

Abstract

India has developed enough through eleven five-year plans after 65 years of independence. The country developed economically but social justice has not been ensured. The outcome of this economic development has not reached the backward communities, particularly the SC/ST communities. Many marginal communities continuously remain in backward position. Social injustice among the various communities has been creating grievance and anarchism. This causes law and order problem in many parts of the country, and the development of the country is also getting hindered. Actual development of the country cannot be achieved if a portion of the population lags behind. All the communities belonging to the SC category have not progressed equally along with the economic development of the country. One such glaring example of this social injustice is the Rajbanshi community of North Bengal. Rajbanshi community constitutes the most pre-dominant section and the early settlers of North Bengal. They are now the poorest of the poor of West Bengal. The Rajbanshis, the largest SC community of West Bengal are deprived of social justice. My comparative study reveals the differences of socio-economic condition of the SCs and the disadvantaged position of the Rajbanshis among the scheduled caste communities. Jalpaiguri is regarded as one of the backward districts of West Bengal and one of the Rajbanshi inhabited areas. In Jalpaiguri district SC population was 36.71%, The Rajbanshis were 23.86% of total population and 65% of SC population in 2001. To consider the condition of economic development along with social justice of the Rajbanshis and to find out the factors responsible for this continuing disadvantaged position

1 Asst. Professor Of Economics, Abhedananda Mahavidyalaya,P.O. Sainthia, Dist. Birbhum , PIN.731234

Attested
Teacher In Charge
Abhedananda Mahavidyalaya
Sainthia, Birbhum

চিহ্নিত করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে মকর সংক্রান্তি বা পৌষসংক্রান্তি গুলোতে মূলত নতুন ফসলের উৎসব 'পৌষ পার্বণ' উদ্‌যাপিত হয়। পৌষ মাসের শেষের দিন এ উৎসব পালন করা হয়।

[২৫] রঙ উৎসবের আগের দিন 'হোলিকা দহন' হয়। হিরণ্যকিশপুর বোন হোলিকা ভক্ত প্রহ্লাদকে হত্যার চেষ্টায় কোলে নিয়ে আগুনে প্রবেশ করলে বিষ্ণুর কৃপায় প্রহ্লাদ অগ্নিকুণ্ড থেকেও অক্ষত থেকে যায়। কিন্তু ক্ষমতার অপব্যবহারহেতু হোলিকার আগুনে অক্ষত থাকার বর নষ্ট হওয়ায় হোলিকা পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। এ থেকেই হোলি কথাটির উৎপত্তি বলে মনে করা হয়ে থাকে।

[২৬] কাশীতে দেবী কুষ্মাণ্ডার মন্দির বিখ্যাত। সেখানে তিনি দুর্গা নামেই সমধিক পরিচিত।

[২৭] "উঠো উঠো পাঁচপীরা হ্যালুমানা আরে অ্যাঙনা আরাধ্যাসিয়া লোগা হে ঠারি।...অ্যাঙ্কা পুকারে হে আঁখা দেহনা নসম বাঁঝা পুকারে হে দুধাধারা হে পুতা, আরে ক্যানাইতে খিজ্যাইতে চ্যালিরে যাহ্যায়।...উঠো উঠো পাঁচ পীরা হ্যালুমানা আরে অ্যাঙনা আরাধ্যাসিয়া লোগা হে ঠারি।" সুনীল চন্দ্র মণ্ডল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬২-৬৩।

[২৮] Wilson, Charles Robert, *The Early Annals of the English in Bengal*, W. Thacker, 1895, 93.

[২৯] আলি খান আকবর, *সপ্তদশ শতকের বাংলায় ধর্মীয় জীবন: কিছু প্রাসঙ্গিক ভাবনা*।

[৩০] *প্রাগুক্ত*।

[৩১] William Crooke, *"Panchpiriya," Encyclopaedia of Religion and Ethics*, 1917, ix, p. 600.

[৩২] *Ibid.*

[৩৩] *Ibid.*

[৩৪] *Ibid.*

[৩৫] *Ibid.*

[৩৬] *Ibid*, p. 601; পাঞ্জাব রিপোর্ট, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২০৬।

[৩৭] Sarkar, Jagadish Narayan, *Islam in Bengal* (Thirteenth to Nineteenth Century), Ratna Prakashan, Calcutta , 1972, p. 37; Rahaman, Shah Noorur, *Hindu-Muslim Relations In Mughal Bengal*, Calcutta, 2001, p. 58.

[৩৮] James Hastings, John Alexander Selbie, Louis Herbert Gray Scribner, *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, Volume 9, 1961, p. 600.

[৩৯] শম্ভুনাথ কুণ্ডু, *প্রাচীন বঙ্গে পৌরাণিক ধর্ম ও দেবভাবনা*, বর্ধমান, ১৯৯৬, পৃ. ১০৯।

[৪০] Swami Mukundananda, *Bhagavad Gita: The Song of God*, 2013.

[৪১] Uma Prasad Thapliyal, *The Dhvaja, Standards and Flags Of India: A Study*, B.R. Pub Corp., 1938, p.71.

[৪২] Roy, Asim, *The Islamic Syncretistic Tradition in Bengal*, Dhaka: Academic Publishers, 1983; আকবর আলি খান, *সপ্তদশ শতকের বাংলায় ধর্মীয় জীবন: কিছু প্রাসঙ্গিক ভাবনা*, https://sanatandharmatattva. wordpress.com/২০১৫/০৫/১ সপ্তদশ-শতকের-বাংলায়-a/©।

[৪৩] মণ্ডল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬২। *(৪৩ সুনীল চন্দ্র মণ্ডল, পশ্চিম বঙ্গের চাঁই সমাজের ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতি, স্বদেশ চর্চা কেন্দ্র, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ১৬২।

[৪৪] http://bharatiyajyotishmantrasaadhana.blogspot.in/2010/04/ significance-and-meanig-of-five-faces.html।

ISSN-1995-1000
ইতিহাস প্রবন্ধমালা ২০১৫

কম্বোজ থেকে কুচবিহার: ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, বিতর্ক ও পর্যালোচনা

বেদদ্যুতি বর্মণ*

গিরিরাজ হিমালয়ের দক্ষিণে এবং বঙ্গদেশের উত্তরে অবস্থিত বিশাল কামতারাজ্য ক্রমে সংকুচিত হয়ে ব্রিটিশের করদ-মিত্র রাজ্যে পরিণত হয় এবং নাম হয় কুচবিহার। এখানে উল্লেখযোগ্য ভুটানের দক্ষিণে করতোয়া, মানস বা সংকোশের মধ্যবর্তী অঞ্চলকে বঙ্গদেশের ইতিহাস রচনাকাররা কখনও বঙ্গদেশের অংশ হিসাবে উল্লেখ করেননি। প্রকৃতপক্ষে এ অঞ্চল বৃহত্তর বঙ্গদেশের সঙ্গে সংযোজিত হয়েছিল ইংরেজ আমলেই প্রথম। এ অঞ্চলের নাম পরিবর্তনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করাই বর্তমান নিবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

কম্বোজদের আদি বাসস্থান: কম্বোজদের আদি বাসভূমি 'কম্বোজ'। কম্বোজ ছিল গান্ধার-এর নিকটবর্তী। কারণ প্রাচীন সাহিত্য ও অশোকের লেখ্যতে গান্ধার ও কম্বোজের নাম সর্বদাই একসঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে। ঐতিহাসিক ভি.ভি. কোসাম্বী মনে করেন, কুক্কুশ্বতী কম্বোজের রাজধানী ছিল। কারণ 'সংযুক্ত নিকায়' গ্রন্থে এর উল্লেখ আছে। হাজারা জেলা ছিল কম্বোজের অন্তর্ভুক্ত এবং এটি পশ্চিমে কাফিরিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত। মহাভারতে কম্বোজে রাজতন্ত্রের কথা উল্লেখ থাকলেও অর্থশাস্ত্র থেকে জানা যায় যে, পরবর্তী কালে এখানে সংঘ শাসনের প্রবর্তন হয়।[১]

কম্বোজদের অভিপ্রয়ান: সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় বা প্রথম শতকে কোনো কারণে কম্বোজদের একটি দল দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে গুজরাটের কাছাকাছি অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। পুরাণে এ ঘটনার উল্লেখ আছে।

> "পুলিন্দাশ্মক জীমৃত-নয়রাষ্ট্র নিবাসিনঃ
> কর্ণাটা কম্বোজ ঘন্টা দক্ষিণাপথ বাসিনঃ
> অম্বষ্ঠা দ্রাবিড়া লাটাঃ কম্বোজা স্ত্রীমুখাঃ শকাঃ
> আনর্ত বাসিনশ্চৈব জ্ঞেয়া দক্ষিণ-পশ্চিমে" (গরুড় পুরাণ ৫৫/১৪-১৫)।

গরুড় পুরাণের এ শ্লোক থেকে বোঝা যায় যে, দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে লাটের পাশে কম্বোজরা তাদের বাসস্থান গড়ে তোলায় সে স্থান কম্বোজ জনপদ নামে পরিচিত হয়েছিল।[২] ৯৪৩ থেকে ৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অল ইস্তখরি ও ইবন্ হৌকল নামক দুজন মুসলমান ঐতিহাসিক 'বলহবা' বা রাষ্ট্রকূট রাজ্যের উত্তর সীমা 'কম্বায়' নামে উল্লেখ করেছেন।[৩] আইন-ই-আকবরীতে এ জনপদ 'কম্বায়েৎ' নামে পরিচিত।[৪] উক্ত কম্বোজ মুসলমান ঐতিহাসিকগণের নিকট 'কাম্বে' নামে পরিচিত। অতএব

* সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়, সাঁইথিয়া, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ।

চর্যাপদের পুনর্গঠন : প্রান্তজনের প্রতিরোধের বৃত্তান্ত

সাগ্নিক দাশগুপ্ত

মহাযানী বৌদ্ধ সাধকদের গুহ্য সাধনপ্রণালী সম্পর্কিত নির্দেশিকাই রূপকের আড়ালে চর্যাপদে প্রকাশিত হয়েছে। যে কায়াসাধনকে অবলম্বন করে তারা পরম-সত্যে উন্নীত হতে চেয়েছেন, সেই সাধন পদ্ধতিই হয়ে উঠেছে এই পদগুলির মুখ্য উপজীব্য। বলা বাহুল্য, এটি কায়াসাধনতান্ত্রিক সাধনপদ্ধতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পন্থা হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মহাযানী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের প্রথম যুগের আচার্যেরা দান-শীল, ক্ষান্তি, বীর্য, ধ্যান, প্রজ্ঞা— এই ছয়টি পরমগুণের অনুশীলনের মাধ্যমেই বোধিসত্ত্বাবস্থাকে স্থায়ী করা সম্ভব বলে মনে করতেন।[১] অবশ্য পরবর্তী পর্যায়ে এই ছয়টি গুণের সঙ্গে উপায়, প্রণিধান, বল ও জ্ঞান—নামক আরও চারটি পারমিতা যুক্ত হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে এই সকল মহৎ গুণাবলির অভ্যাস ও জীবনাচরণে যথার্থ প্রতিফলন বিশেষভাবে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। এই পরিস্থিতিতেই আচার-অনুষ্ঠান-নির্ভর তন্ত্রাচার মহাযানী বৌদ্ধধর্মে অনুপ্রবিষ্ট হয়। যেহেতু এই পর্যায়ে বৌদ্ধ মহাযানী সম্প্রদায়ের আচার্যগণ সমস্ত চাহিদাকে পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়েই তান্ত্রিক ক্রিয়াচারের বিবর্তন ও বিকাশ, সেহেতু মহাযানী বৌদ্ধধর্ম নিম্নবর্ণীয় সমাজে বিশেষভাবে গৃহীত হয়েছিল। আসলে আচার্যগণ বুঝেছিলেন তাঁদের আচরিত ধর্মকে কোনো একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে না রেখে, সমাজের সকল স্তরের মধ্যে প্রসারিত করতে হলে প্রত্যেকের যাপিত জীবন ও জীবিকার সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করেই অসীমের সন্ধান দিতে হবে। প্রসঙ্গত Miranda Shaw তাঁর 'Passionate Enlightenment women In Tantric Buddhism'— গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলেছেন—

> *Tantra can be practiced in any setting. Although Tantric Buddhism offers many practices, no single method is formally required. What is sought is a way to cut through ordinary awareness as directly possible, in order to attain enlightenment in a single lifetime. The best method for doing this will be different for each persons so teachers assign whatever practices they consider most appropriate for a particular students.*[২]

এই সাধারণ জীবনকে স্বীকৃতি দিতে গিয়েই, সাধারণ জনজীবনের বিভিন্ন প্রসঙ্গ চর্যাপদে অনিবার্যভাবে স্থান করে নিয়েছে। বিশেষত যে প্রান্তিক জীবন হিন্দু সমাজপতিদের কৃত বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার বাইরে অবস্থিত ছিল; সেই প্রান্তজীবনের

মনেক সুপ্ত বা লুপ্তপ্রায়
র 'শ্রীধর্মমঙ্গল' কাব্যকে

কাতা : ভারবি, ২০১৫
২; ৫. তদেব, পৃ.৭৬;৬.
, পৃ.২৮৩; ১০. তদেব,
পৃ. ২৮২; ১৪. তদেব,
ব, পৃ.৮১; ১৮. তদেব,
১৯; ২২. তদেব, পৃ.৬২;
; ২৬. তদেব, পৃ.১২৩;
০. তদেব, পৃ.১২৭; ৩১.

কাতা : পুস্তক বিপণি,

কাশ, কলকাতা পুস্তক

প্রকাশ, কলকাতা, বুক

কপিলামঙ্গালের বাংলা পুথি

সাগ্নিক দাশগুপ্ত

ভারতবর্ষের সনাতন জীবনে গো-মহিমা বিশেষভাবে স্বীকৃত হয়েছে। উৎপাদন-সম্পর্কে প্রাধান্যের কারণে এই উপকারী প্রাণীটি প্রাচীন ভারতীয় সমাজ জীবনে দৈব্য ভূমিকায় উন্নীত হয় বৈদিক যুগে গো-ধনের বিশেষ তাৎপর্যের কথা পরিলক্ষিত হয়। বৈদিক ঋষিগণ ৬/৫৪/৭ সংখ্যক (প্রথম সংখ্যাটি মণ্ডল-সুচক, দ্বিতীয়টি সুক্ত-সূচক এবং তৃতীয়টি ঋক্-সংখ্যা) ঋকে পূষার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন, এই বলে— "মাকির্নেশন্মাকীং রিষন্নাকীং সংশারি কেবটে।/অথারিষ্টাভরা গহি॥" অর্থাৎ, হে পূষা। আমাদের গোধন যেন নষ্ট না হয়। এ যেন ব্যাঘ্রাদি দ্বারা নিহত না হয়। কূপপাত দ্বারা যেন বিনষ্ট না হয়। অতএব তুমি অহিংসিত সে ধেনুগনের সাথে সায়ংকালে এস।[১]

কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র'-এ দেখা যাচ্ছে, গো-পালন সমাজে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হচ্ছে। অর্থশাস্ত্রে 'দ্বিতীয় অধিকরণ'-এর অন্তর্গত 'ঊনত্রিংশ অধ্যায়'-এর নাম হল 'গোধ্যক্ষ'। অর্থাৎ গো-পালনকারী কর্মচারী কীরূপে গো-প্রতিপালন করবেন, সেই সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা এখানে প্রকাশিত হয়েছে। গোধ্যক্ষ নিম্নলিখিত আট প্রকার কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিবেন, যথা—১. বেতনোপগ্রাহিক, ২. কর প্রতিকর, ৩. ভগ্নোৎসৃষ্টক, ৪.ভাগানুপ্রবিষ্টক, ৫. ব্রজপর্য্যগ্র, ৬. নষ্ট, ৭. বিনষ্ট, ৮. ক্ষীরঘৃতসঞ্জাত।[২] আসলে এই সমস্ত সূত্রগুলি উদ্ধারের মাধ্যমে, প্রাচীন ভারতীয় সমাজে যুগপরম্পরা বাহিত গো-প্রতিপালনের বিশেষ তাৎপর্যের দিকটিকে সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করা গেল। এক্ষণে আসা যাক, কপিলা ধেনুর প্রসঙ্গে। কপিলা ধেনুর কথা আমরা মহাভারতে লক্ষ করেছি। মহাভারতের 'অনুশাসন পর্ব'-এ গো-জাতির মধ্যে কপিলার স্থান সকলের উর্ধ্বে বলে উল্লিখিত হয়েছে।[৩] মহাভারতের 'অনুশাসন পর্ব্ব'-এর 'সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়'-এ 'কপিলালক্ষণ' প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

> ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্মরাজ! আমি বৃদ্ধদিগের নিকট কপিলার উৎপত্তি বিষয় যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্বকালে ভগবান্ স্বয়ম্ভু দক্ষকে প্রজাসৃষ্টি করিতে আদেশ করিলে, দক্ষ প্রজপতি প্রজাদিগের হিতসাধনার্থ সর্ব্বপ্রথমে তাহাদিগের জীবনোপায় নির্ধারিত করিয়েছিলেন। দেবগণ যেমন অমৃত অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করেন, তদ্রূপ প্রজাগণ দক্ষনির্দ্দিষ্ট জীবিকা অবলম্বন করিয়া প্রাণধারণ করিতেছে। স্থাবর ও জঙ্গম পদার্থ

কবিবল্লভের 'শীতলামঙ্গল' — চন্দ্রকেতু পালা

সংগ্রহ ও সংকলন : সাগ্নিক দাশগুপ্ত

ঋতু বসন্ত কেবল যৌবনের বাণী বহন করে আনে না, রোগের বিষম বার্তাও সঙ্গে নিয়ে আসে। বসন্তের এই 'বিষম' আশীর্বাদের হাত থেকে নিস্তার পেতেই শীতলা পুজোর আয়োজন। সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়েই এই দেবীর বিভিন্ন রূপভেদের পুজো করা হয়।

কবিবল্লভ-এর শীতলামঙ্গল-এর এই পুথিটিতে কাব্যারম্ভে 'ষষ্ঠী'-কে স্মরণ করা হয়েছে, যা আমাদের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। বলা বাহুল্য, ষষ্ঠীর ঠিক পরবর্তী তিথিই হল সপ্তমী। আবার বাংলায় শ্রী-পঞ্চমীর পরের দিন 'শীতল-ষষ্ঠী' সংক্রান্ত বিভিন্ন আচার-প্রথাও সর্বজনবিদিত। শীতলা দেবীর স্বরূপ সংক্রান্ত বিশদ আলোচনা শীতলামঙ্গল কেন্দ্রিক আলোচনা সংখ্যায় প্রকাশ করার ইচ্ছা রইল। যাই হোক, বাংলায় রচিত বিভিন্ন শীতলামঙ্গল-এ ব্যাধি নিয়ন্তা দেবীর রূপটিই মূলত প্রকাশিত হয়েছে। মর্ত্যলোকে তার পূজা প্রচারের প্রধান অস্ত্র হল বসন্ত। একাজে দেবীর প্রধান সহায়ক হল জ্বরাসুর। কাব্যের সূচনাতেই দেখতে পাচ্ছি প্রধান পাত্র জ্বরাসুরের সঙ্গে দেবীর শলাপরামর্শ —

ঈশ্বরি বলেন শুন পাত্র জ্বরাসুর।
তব তুল্য পৃথিবীতে কে আছে অসুর।।
সকল জিবেতে আমার অধিকার।
মনশ্য হইতে পূজা হইবে প্রচার।।
চৌষট্টি বসন্ত মাতা ডেকে আন তুমি।
পূজার বিধান কথা বলে দিব আমি।।

এই চৌষট্টি বসন্তের প্রতাপে চন্দ্রবংশের নরপতি চন্দ্রকেতুর রাজ্যে কীভাবে শীতলা পূজা প্রচারিত হল— তাই এই কাব্যের কেন্দ্রিয় বিষয়। কবিবল্লভ বসন্তের বিভিন্ন নাম এই কাব্যে তুলে ধরেছেন। যদিও তার সংখ্যা চৌষট্টি নয়। চৌষট্টি বসন্তের নাম হল—

১. বিষচর্মদল, ২. কালচর্মদল, ৩. ধূকড়িচর্মদল, ৪. মহিষচর্মদল, ৫. রক্তচর্মদল, ৬. রক্তবিকার, ৭. সর্বত্র রোগরাজা, ৮. সর্বত্র গুণরাজা, ৯. সূর্য্যমুখ, ১০. আসবাতায়, ১১. বাতরাজা, ১২. বিস্ফোটক, ১৩. গর্বচূনা, ১৪. নাগান্তক, ১৫. শরান্তক, ১৬. গজহাটক, ১৭. কুলান্তকায়, ১৮. জ্বালান্তকায়, ১৯. কুচ্ছিতকায়, ২০. গুরুদলায়, ২১. কুশধূলায়, ২২. হাম্বিরায়, ২৩. সন্নিপাতায়, ২৪. ভূতমুখা, ২৫. শিশিরা, ২৬. বৈঁচা, ২৭. মসুর, ২৮. তিল, ২৯. বেত্রফুল ৩০. কালচিমটা, ৩১. মহিষ, ৩২. মুদগাঁ, ৩৩. সন্নিশীল, ৩৪. রক্ত, ৩৫. চন্দ্রমুখ, ৩৬. অস্থিগলা, ৩৭. মাংসঝরা, ৩৮. গলাফুলা, ৩৯. তরা, ৪০. জীবা, ৪১. পানিফল, ৪২. ঝঙ্কার, ৪৩. ঝর্ঝর, ৪৪. জম্বিকা, ৪৫. ধকধক, ৪৬. কটকট, ৪৭. চিড়চিড়, ৪৮. কিটকিট, ৪৯. ঘুটঘুট ৫০. সরিষাফুল, ৫১. কুচমুড়া, ৫২. বেলপড়া. ৫৩. কালমুখ, ৫৪. ধুতরা, ৫৫. বেলথপা, ৫৬. কিরীট, ৫৭. স্বর্ণপা, ৫৮. সঙ্কটা ৫৯. নারাঙ্গা, ৬০. পর্বতচূর্ণা, ৬১. কণ্ঠনাল, ৬২. অন্তপাতক, ৬৩. কোচমুখ, ৬৪. শীলশীলা।

একালের মঙ্গলকাব্য : পাঠ-প্রতিক্রিয়ার আলোকে

সাগ্নিক দাশগুপ্ত

আনুমানিক ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে যে বিশেষ এক শ্রেণির ধর্ম-বিষয়ক আখ্যান-কাব্য প্রচলিত ছিল, তা-ই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত। দেব-দেবীর পূজা প্রচারই ছিল এই কাব্যগুলির মূল বিষয়। স্বাভাবিকভাবেই অলৌকিকতা ও নিয়তিনির্ভরতা একাব্যগুলির কেন্দ্রীয় আখ্যানে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রায় অধিকাংশ মঙ্গল-কবিই তাঁদের কাব্য রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে দেবতার স্বপ্নাদেশের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন, চণ্ডীমঙ্গলের বিখ্যাত কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী কাব্য-রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন—

দেবী চণ্ডী মহামায়া ছিলেন চরণ ছায়া
আজ্ঞা দিলেন রচিতে সঙ্গীত।[১]

এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক রণজিৎ গুহের বক্তব্য—

নিম্নবর্গের চৈতন্যের অপর যে লক্ষণটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য তা হচ্ছে ধর্মভাব। ধর্মভাব বলতে আমি শুধু ধর্মীয় সংস্থার প্রতি আনুগত্য বোঝাচ্ছি না, বোঝাচ্ছি চেতনার সেই ঐতরিক বা 'এলিয়েনেটেড' অবস্থার কথা যার প্রভাবে জড়জগৎ বা জীবজগতের কোন সত্তাকে, বাস্তবের বা ভাবনার অন্তর্গত কোন বিষয়কে তা যথার্থভাবে ধারণার মধ্যে আনতে পারে না এবং এক বিষয়ের উপর আরেক বিষয়ের গুণ আরোপ করে। ফলে যা ঐহিক তাকে অলৌকিক বলে মনে হয়। যা একান্তই মানবিক তাকে দৈব বলে ভুল হয়। ঐতরিকতার আতিশয্যেই কর্তা কখনও কখনও নিজের সৃষ্টিকেই সঠিকভাবে চিনতে পারে না। যা তার নিজের প্রতিভাজাত তাকে সে অন্যের কৃতিত্ব বলে বর্ণনা করে। তাই মঙ্গলকাব্যের কোন মহৎ কবির পক্ষে বলা সম্ভব যে তাঁর রচনা তাঁর নিজের নয়, আরাধ্যা দেবী তাঁকে দিয়ে লেখাচ্ছেন : কবি যন্ত্র, দেবী যন্ত্রী।[২]

এই কাব্যগুলিতে অলৌকিকতা ও নিয়তি-নির্ভরতার প্রসঙ্গ স্বীকার করে নিয়েও, এ কথাটা মানতেই হবে যে—মানুষের ইহজীবনের বৃত্তান্ত এখানে বিস্তৃত আকারে ঠাঁই পেয়েছে। দেবতার কথা লিখতে বসে মঙ্গল-কবি মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রেম-বিরহের যাপনকথাকে এড়িয়ে যেতে পারেননি। বরং যুগ-বৈশিষ্ট্যজাত সেই মানসিক সংকীর্ণতার পরিসরেই মানবজীবনের ডিটেলিং এ কাব্যগুলিতে বারে-বারে প্রকাশিত হয়েছে। মানবজীবনের এই বহুমাত্রিক প্রকাশ স্বাভাবিকভাবেই ভাবীকালের পাঠককেও স্পর্শ করেছে। তথাকথিত আধুনিক সময়ের পাঠক মঙ্গলকাব্যের অন্দরে এই ইহজীবনের কথাকে আত্মস্থ করেই, এর সম্ভাব্যতার জায়গাগুলিকে চিহ্নিত করেছে। বলা বাহুল্য, এই সম্ভাব্যতা নির্ণয় একালের পাঠকের মানসবৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এ প্রসঙ্গে প্রাজ্ঞ সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যের অংশবিশেষ আমরা উল্লেখ করতে পারি—

মধ্যযুগীয় ভাবাকর্ষ থেকে কোনো চরিত্র বা ঘটনাকে চয়ন করে আজকের জীবনজটের গূঢ় রহস্যের চাবিকাঠি হিসাবে ব্যবহার করা কঠিন। লোকায়ত মীথকে কাব্যে প্রয়োগকালে প্রত্নরিচুয়ালের ধূসর মুটি থেকে তাকে মুক্ত করতে হয়—অথচ লক্ষ্য রাখতে হয়, আধুনিক টেনশনের উপযুক্ত অবজেকটিভ কোরিলেটিভ বা বহিরাধারে তা আজও যেন সক্ষম হয় ব্যক্তির ইমোশনকে, আকাঙ্ক্ষা ও সংকল্পকে সঠিক পথগামী করে তুলতে।[৩]

কবি-অধ্যাপক উত্তম দাশ তাঁর 'একালের মঙ্গলকাব্য'-এ মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যের বিষয় সমূহকে আত্মস্থ করে, একালের স্বরকে তার অন্দরে প্রকাশ করেছেন। এ কাব্যগ্রন্থের ৫০টি কবিতা ২৪শে মে, ১৯৯৯ থেকে ২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০০২ সময় পর্বে রচিত। মঙ্গলকাব্যের পাশাপাশি চৈতন্য এবং কৃষ্ণ কথারও পুনর্নির্মাণ এই কাব্যগ্রন্থে পরিলক্ষিত হয়।

মঙ্গলকাব্য : ইতিহাসের প্রেক্ষিতে

সাগ্নিক দাশগুপ্ত

মঙ্গলকাব্য - সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত পরিসরে মঙ্গলকাব্য এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তুর্কী আক্রমণের পরবর্তীকালে এক অবক্ষয়িত সমাজের বুকে এই সাহিত্যধারার উদ্ভব এবং পরবর্তী কয়েক শতক জুড়ে তার বিস্তার পরিলক্ষিত হয়। আশুতোষ ভট্টাচার্য মঙ্গলকাব্যের সংজ্ঞা নির্ধারণ প্রসঙ্গে বলেছেন—

> "আনুমানিক খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত যে বিশেষ এক শ্রেণীর ধর্মবিষয়ক আখ্যানকাব্য প্রচলিত ছিল, তাহাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত।"[১]

এ প্রসঙ্গে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

> "খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত এমনকি তারও পরে অনেক মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে। গোটা বাংলাদেশেই এই মঙ্গলকাব্যসমূহের অসাধারণ প্রভাব দেখা যায়। . . . বিভিন্ন দেবদেবীর পুজা প্রচার সম্বন্ধীয় এক প্রকার আখ্যনকাব্যকে মঙ্গলকাব্য বলে।"[২]

শিশির কুমার দাশ বলেছেন—

> "Like the Natha stories several legends of the hunter Kalketu or the sailor Dhanapati or the courageous Behula who like the Savitri of the Mahabharata, brought back her husband from death – originated in this period. These poems came to be known as Mangal Kabyas."[৩]

উপরে উদ্ধৃত বিভিন্ন সংজ্ঞায় মঙ্গলকাব্যের যে সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলি হল—

ক. ধর্মবিষয়ক আখ্যানকাব্য।

খ. লৌকিক দেব-দেবীর পূজা প্রচার এর মূল বিষয়।

গ. লৌকিক গ্রাম্য দেব-দেবীর প্রাধান্য এই কাব্যগুলিতে পরিলক্ষিত হয়।

ঘ. এই কাব্যগুলি গ্রামের বিভিন্ন মন্দিরে লৌকিক দেবতার পূজা উপলক্ষে ভক্ত সমারোহে গান করা হয়।

ঙ. বিভিন্ন জটিল ব্যাধি থেকে মুক্তি এবং প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা থেকে রক্ষা পেতে সর্বোপরি সার্বিক কল্যাণ আকাঙ্খায় এই কাব্যগুলি গীত হয়।

এই কাব্যধারার সৃষ্টি আকস্মিক নয়। পূর্বকালে বিভিন্ন লোককথার মধ্যে এ কাব্যের কাহিনি অংশের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই লোককথাগুলিই কবিদের শৈল্পিক চেতনার স্পর্শে কাব্যরূপ লাভ করেছে। দীর্ঘদিন ধরে এই আখ্যানকাব্যগুলি একই আঙ্গিকে রচিত হওয়ার ফলে, স্বাভাবিকভাবেই এগুলির কাহিনিবয়ন সম্পর্কিত বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু বিধি-বিধানের সৃষ্টি হয়েছিল। যেমন—প্রায় প্রতিটি মঙ্গলকাব্যই চারটি অংশে বিভক্ত— ক. বন্দনাখণ্ড, খ. গ্রন্থোৎপত্তির কারণ, গ. দেবখণ্ড, ঘ. নরখণ্ড।

ইতিহাস ও সাহিত্য : সম্পর্কের যোগ-বিয়োগ

ইতিহাস এবং সাহিত্যের পারস্পরিক তুলনা অনুভূমিক অক্ষে বিবেচনাধীন হতে পারে। যেকোন দুটি বিষয়ে তুলনার মত এদের মধ্যেও পারস্পরিক সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য সূচিত হয়। বৈসাদৃশ্য প্রসঙ্গে বলা যায়, ইতিহাস যেখানে ঘটে যাওয়া অতীতকে নিয়ে কাজ করে; সেখানে সাহিত্য গড়ে ওঠে অতীত-বর্তমান এবং ভবিষ্যতের যথাক্রমে পূর্বঘটিত, ঘটমান ও

সম্ভাব্য বিষয়কে অবলম্বন

"Poetry, there
more concerned with

এই দার্শনিক মন্ত
প্রদানের ইতিবৃত্ত আমাদে
গ্রন্থের বিষয় বিশ্লেষণে প্র
কর্মপন্থা ও সংস্কৃতির বহু
সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। সুত
খণ্ডিত হয়। একারণেই সা

"সমস্ত জনশ্রুতি,
থাকিবে। যাহা তথ্য হিসাবে
ঐতিহাসিক সত্য পাওয়া য
ইতিহাস।"[৪]

অপরদিকে সাহিত্যও ইতিহ
অন্তরে একটি দেশ-কালের
ইতিহাসচেতনা সবিশেষ গুর
দাশগুপ্তের একটি মন্তব্যকে

"ঐতিহাসিক মানসি
নেই- সেহেতু ঘটনার বর্ণনার
সেই কাজ সাহিত্যিকের।"[৫]

এক সাম্প্রদায়িক ধর্ম
কাব্যগুলির ভরকেন্দ্রে অলৌকি
বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে
দেবতার মাহাত্ম্য প্রচার। কিন্তু
-কবি সাহিত্য রচনায় ব্রতী হয়ে
দেহেই স্বর্গলোকের পোশাক প
মেদ-মজ্জা সমন্বিত মানবজীবনে
পাওয়া, আনন্দ-বেদনা, হাসি-ক
হয়েছে। যদিও এর পাশাপাশি
অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেনি। কারণ,
রেখে, কাব্যের কেন্দ্রীয় বিষয়ে ফি
আরেকবার স্মরণ করা দরকার
এবং বিকাশ। সেই কাললগ্নে ফি

প্রকৃতি, প্রকৃতিসংলগ্ন মানবজীবনের
দলিল আমাদের সামনে জীবন্তরূপে
ত্তার অন্তরালে লেখকের ভ্রমনরসিক
ত হয়।

১৯৬৬, পৃ. ২৪৭।

বিষ্ণু দে-র কবিতা : আন্তর্জাতিক চোখে
আত্ম-অন্বেষণের প্রক্রিয়া

সাগ্নিক দাশগুপ্ত

কথামুখ :

বাংলা আধুনিক কবিদের বৃহত্তর সরণিতে বিষ্ণু দে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলস্টোন। রবিরশ্মির উজ্জ্বল কিরণ থেকে সরে আসতে বিশ শতকের বাঙালি কবিরা যখন একটি নতুন দিগন্তের অন্বেষণে নিমগ্ন ; ঠিক সেই মুহূর্তেই বাংলা কাব্যভুবনে আবির্ভাব ঘটল বিষ্ণু দে-র। পথ চলার শুরুতেই ভবিষ্য চলনের মানচিত্রটাকে যেন তিনি ঠিক করে নিলেন। প্রকাশ করলেন তাঁর কবি মননের ম্যানিফেস্টো—

রবীন্দ্রব্যবসা নয়, উত্তরাধিকার ভেঙে ভেঙে
চিরস্থায়ী জটাজালে জাহ্নবীকে বাঁধিনা, বরং
আমরা প্রাণের গঙ্গা খোলা রাখি, গানে-গানে নেমে
সমুদ্রের দিকে চলি, খুলে দিই রেখা আর রং।[১]

এলিয়ট শিষ্যের এই আত্মগত স্পর্ধিত উচ্চারণ কিন্তু চোরাবালির শূন্য অস্তিত্বে ডুবে মরেনি ; বরং রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতা এরই মধ্যে খুঁজে পেল এক নতুন ডায়মেনশন। রাবীন্দ্রিক ঐতিহ্য, পাশ্চাত্য মনন এবং স্বীয় প্রতিভার রসায়নে গড়ে উঠল এক নতুন কাব্যশরীর। যে শরীরের অন্দরমহলের টোপোগ্রাফিতে গোটা বিশ্ব, চৈতন্যে গ্লোবালাইজড সত্তার অবস্থান আর প্রাণে সামগ্রিকতার মরমীয়া সিম্ফনি–'ভালেরির আত্মভুক্ সর্পে নয়, আমাদের লেখকেরা জানেন যে বিশ্বরূপদর্শনেই ব্যক্তির ঐশ্বর্য।'[২]

বিষ্ণু দে-র হয়ে ওঠা :

বিষ্ণু দে-র জন্ম ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে কলেজ স্কোয়ার অঞ্চলে এক বনেদী পরিবারে। তাঁর পিতা অবিনাশচন্দ্র দে এবং মাতা মনোহারিনী দেবী। তাঁদের পারিবারিক পরম্পরায় উচ্চশিক্ষার স্রোত ছিল বহমান। বিষ্ণু দে-র বঠ্ঠাকুরদা শ্যামাচরণ দে ছিলেন ইংরেজ সরকারের প্রথম গেজেটেড অফিসার (তাঁরই নামে বিখ্যাত বইপাড়ার রাস্তাটির নাম শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট)। ডেভিড হেয়ার এবং বিদ্যাসাগরেরও এই দে পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র ছিল। যাই হোক, তাঁর জন্মলগ্নটাও বিশ্ব ইতিহাসে এক ক্রান্তিকাল। ঊনিশ শতকীয় নবজাগরণে আলোকসঞ্জাত বাঙালি মধ্যবিত্ত সত্তা বিশ-শতকে এসে দর্শনে-চৈতন্যে-সৃজনশীলতার বৃত্তে আরেক ধাপ উন্নতির প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত হয়েছিল। ১৯০৫ থেকে শুরু হওয়া বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি চলে এল লাইম লাইটের কেন্দ্রে। ১৯১২-র বঙ্গভঙ্গ রোধের মাধ্যমে এদের প্রয়াস অবশেষে পূর্ণতা পেল। এই সাফল্যের পরবর্তী ধাপ ছিল নিজেদের স্বতন্ত্র অবস্থানকে ছেড়ে দিয়ে নিম্নশ্রেণির মানুষের সঙ্গে পারস্পরিক বিমিশ্রণ এবং ভাবের আদান-প্রদান। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যর্থ হল তারা। এরই মধ্যে ১৯১৪-তে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল। যার অভিঘাতে সমস্ত পৃথিবী পরিণত হল এক 'Wasteland'-এ। মানুষের অস্তিবাদী চেতনায় দেখা দিল এক বিশাল ফাটল। চারিদিকে তখন তার নিরাপত্তার সংকট। মর্মে ও মজ্জায় জমেছে গভীর অবিশ্বাস। ১৯১৬-তে ভারতব্যাপী হিন্দু-মুসলমান ঐক্যে ভাঙন ধরা পড়ল। যারই সুদূরপ্রসারী ফল ১৯৪৬-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং ৪৭-এর দেশভাগ। এইসব পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর

শশিভূষণ দাশগুপ্ত (১৯১১-১৯৬৪)

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ চর্চার ইতিহাসে শশিভূষণ দাশগুপ্ত-র ভূমিকা অনস্বীকার্য। মধ্যযুগ পর্বে বাংলাদেশে বিভিন্ন সাধন-প্রণালী এবং সেই সাধন-তত্ত্বের প্রভাব সম্পৃক্ত সাহিত্যের বিস্তৃত বিবরণ তাঁর রচিত গ্রন্থগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে। এই গুহ্য সাধন- প্রণালী সম্পর্কে অবগত না হয়ে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ পাঠ কখনোই সম্ভব নয়। শশিভূষণের বিভিন্ন গবেষণা গ্রন্থগুলিতে এই সত্যটিই ধরা পড়েছে। বিশেষ ধর্মীয় দর্শনগত প্রস্থানের ভিত্তিতে মধ্যযুগ পর্বে বাংলা সাহিত্য বিচারের যে প্রেক্ষিতটি তিনি প্রস্তুত করেছিলেন, পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ এবং লোকায়ত সংস্কৃতির বিশেষজ্ঞগণ এই পথেই অগ্রসর হয়ে একাধিক গবেষণা-কর্ম প্রকাশ করেছেন।

১৯১১ খ্রিঃ-এ অবিভক্ত বাংলাদেশের বরিশাল জেলার অন্তর্গত চন্দ্রধর গ্রামে শশিভূষণের জন্ম হয়। তিনি বরিশালের বি. এম. কলেজ থেকে আই. এ. ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর দর্শনশাস্ত্রে সাম্মানিক নিয়ে পড়াশোনা করার জন্যে কলকাতায় এসে স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তিনি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৩৫ খ্রিঃ-এ শশিভূষণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে গবেষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৩৭-এ গবেষণাকর্মে বিশেষ পারংগমতার জন্য তাঁকে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি দেওয়া হয়। ১৯৩৯-এ গবেষণা কর্মের জন্য তিনি পি. এইচ. ডি. উপাধি প্রাপ্ত হন এবং ঐ বছরেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে নিযুক্ত হন। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ পর্বের ওপর রচিত তাঁর উল্লেখযোগ্য গবেষণাগ্রন্থগুলি হল—

১। *Obscure Religious Cults : As a Background of Bengali Literature* (১৯৬৪)
২। *An Introduction to Tantric Buddhism* ('৫০)
৩। *শ্রীধারার ক্রমবিকাশ : দর্শনে ও সাহিত্যে* ('৫২)
৪। *ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য* ('৬০)
৫। *বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীত* ('৬৪)

—এই গ্রন্থগুলিতে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, তান্ত্রিক, বৌদ্ধধর্ম, সহজ সাধনের বিভিন্ন গুহ্য প্রণালীর বিবরণ ও বিশ্লেষণ পরিলক্ষিত হয়। দর্শনশাস্ত্রে তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি বিভিন্ন সাধন-প্রণালীর গভীরতর বিশ্লেষণে তাঁকে সাহায্য করেছে। ১৯৬১ খ্রি.-এ 'ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য' গ্রন্থের জন্য তিনি সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৬৪-এর ২১শে জুলাই এই যশস্বী গবেষক-অধ্যাপকের অকালপ্রয়াণে বাংলা সাহিত্য গবেষণার জগতে সমূহ ক্ষতি হয়।

লিখন : সাগ্নিক দাশগুপ্ত, গবেষক, বিশ্বভারতী, বাংলা বিভাগ।

ড. পঞ্চানন মণ্ডল-এর রাঢ় বিষয়ক প্রবন্ধে রাঢ় বঙ্গের ইতিহাস ও সংস্কৃতি : একটি আলোচনা

চন্দনকুমার কুণ্ডু

পঞ্চানন মণ্ডল ১৯১৬ খৃ: ২২ অক্টোবর (৫ কার্ত্তিক ১৩২৩, রবিবার) বর্ধমান জেলায় চণ্ডীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি কবিকঙ্কন মুকুন্দের এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন বিজয়গঞ্জ গ্রামের জমিদার ভূবনমোহন মণ্ডল, আর মাতা মিসরীবালা মণ্ডল। গ্রামের পাঠশালায় পড়ার পর ইংরেজী স্কুলে ভর্তি হন ও পরে (১৯৩০-৩৩ খৃ:) মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলে পাঠ আরম্ভ করেন। ১৯৩৪ সালে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যান, ১৯৩৬-এ শান্তিনিকেতনে এবং ১৯৩৮-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যান।

১৯৪০ সালে এম.এ. পাস করার পরে তিনি বর্ধমান সাহিত্য সভার সঙ্গে যুক্ত হন। এর পর অধ্যাপক ড. সুকুমার সেন ও পঞ্চানন মণ্ডলের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'রূপরামের ধর্মমঙ্গল' (প্রথম খণ্ড)। ১৯৪৬ এর সেপ্টেম্বরে তিনি বিশ্বভারতীর বিদ্যাভবনে পুঁথি বিভাগে কাজ শুরু করেন। এখানে তাঁর কর্মধারার মধ্যে অন্যতম ছিল—পুঁথি সংগ্রহ, তালিকা প্রস্তুতি ও প্রাচীন পুঁথি সম্পাদনা। এখান থেকে প্রথম বই 'গোর্খ বিজয়' প্রকাশিত হয় ১৯৪৯-এ। পরে বিশ্বভারতী থেকে ক্রমান্বয়ে 'পুঁথি পরিচয়' (১ম-৬ষ্ঠ খণ্ড) প্রকাশিত হয়। তিনি ১৯৪৬-৮১ খৃ: পর্যন্ত বিশ্বভারতী বিদ্যাভবনের অধ্যাপক, গবেষক, পুঁথি সংগ্রাহক ও সম্পাদক হয়ে ওঠেন।

ড. পঞ্চানন মণ্ডলের 'রাঢ় প্রীতি' ছিল খুব গভীর, রাঢ়ের ইতিহাস উদ্ধার তাঁর জীবনের অন্যতম সংকল্প ছিল বলা চলে। সে জন্যই তিনি 'রাঢ় গবেষণা পর্ষদ' স্থাপন করেন। উৎসাহী ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে রাঢ় গবেষণার কাজও তিনি চালিয়ে গেছেন। রাঢ়বঙ্গকে কেন্দ্র করে রচিত তাঁর একাধিক প্রবন্ধই 'রাঢ়প্রীতি'র প্রমাণ স্বরূপ বলা যায়।

তিনি নানা সময়ে রাঢ়ের নানা ঐতিহ্যের সন্ধানে যেমন ব্রতী হয়েছেন তেমনি রাঢ়ের কিংবদন্তীর সঙ্গে সাহিত্য ও ঐতিহাসিক তথ্যের মেলবন্ধন করে পুরাতন ইতিহাস চর্চাতে ও গবেষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। শুধুমাত্র অজয় তীরবর্তী রাঢ় বঙ্গ নয়, বৃহত্তর রাঢ়ের ঐতিহ্য, ইতিহাস, সাহিত্য ও সংস্কৃতির তথ্যানুসন্ধানের পরিচয় তাঁর যুক্তিনির্ভর ও তথ্যবহুল প্রবন্ধগুলিতে পাওয়া যায়।

'অজয়' উপত্যকায় অবিচ্ছিন্ন রাঢ়ীয় ঐতিহ্যের সন্ধানে' শীর্ষক প্রবন্ধে 'শ্রীপাট মুলুক গ্রামে মহাপুরুষ শ্রীরামকানাই ঠাকুরের স্মৃতি বাসরের উদ্বোধন' অনুষ্ঠান উপলক্ষে দেওয়া বক্তৃতাটিই আলোচ্য প্রবন্ধ। এখানে অজয় উপত্যকার অবিচ্ছিন্ন ঐতিহ্যের

বীরভূমের বাউল : স্বাতন্ত্রে ও জনপ্রিয়তায়

চন্দনকুমার কুণ্ডু*

বাংলার লোক সংস্কৃতির বিশিষ্ট একটি দিক হল বাউল গান। শুধু লোক সংস্কৃতিই বা বলি কেন, বাউলগান বর্তমানে বাংলার অভিজাত সংস্কৃতিতেও জায়গা করে নিয়েছে। বাউল শব্দটিকে উন্মত্ত, ভাবোন্মত্ত প্রেমোন্মত্ত প্রভৃতি অর্থে গ্রহণ করা যায়। সম্ভবত 'বাতুল' শব্দ থেকে বাউল শব্দটি বাংলা ভাষায় এসেছে। শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের রচয়িতা মালাধর বসু তার উক্ত গ্রন্থে প্রথম 'বাউল' শব্দটি ব্যবহার করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পাদনায় শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের একট অতিরিক্ত অংশে বাউল শব্দের ব্যবহার আছে এভাবে —

"মুকুল (৩) মাথায় চুল নাংটা যেন বাউল
রাক্ষসে রাক্ষসে বুলে রণে।
বিকটান কাড়ি রায় বলে মাংস কাড়ি খায়
রক্ত পড়ে গলিয়া বদনে।।"

(কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ, পৃ. — ৫২৯)

কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে এই 'বাউল' শব্দটি বেশ কয়েকবার ব্যবহৃত হতে দেখি।

ক. "প্রভু কহে, বাউলিয়া ঐছে কাঁহে কর?"

(চৈতন্যচরিতামৃত, আদি, ১২ পরিচ্ছদ)

খ. "আমি ত বাউল আন্ কহিতে আন্ কহি।
কৃষ্ণের মাধুর্যস্রোতে আমি যাই বহি।।'

(চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য খণ্ড, ২১ পরিচ্ছদ)

গ. 'নীবিবন্ধ পড়ে খসি বিনামূল্যে হয় দাসী
বাউলী হঞা কৃষ্ণপাশে ধায়"

(চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যের ১৭ পরিচ্ছদ)

চণ্ডীদাসের ভনিতা যুক্ত বৈষ্ণব সহজিয়া ও সাধন প্রণালী সমন্বিত 'রাগাত্মিকা পদে' ও 'বাউল' শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়।

শুন মাতা ধর্মমতি বাউল হইনু অতি
কেমনে সুবুদ্ধি হবে প্রাণী?

(মণীন্দ্রমোহন বসু সম্পাদিত রাগাত্মিকা পদ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়', 'চৈতন্যচরিতামৃত', 'রাগাত্মিকাপদ' প্রভৃতিতে বাউল শব্দটিকে এভাবেই পাওয়া যায়। পরবর্তীতে মহাজ্ঞান শূন্য ভাবোন্মাদ বা ধর্মোন্মাদ,

* অধ্যাপক, অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়

CONTRIBUTION OF TRIBAL IN TEBHAGA MOVEMENT IN DUARS OF JALPAIGURI DISTRICT

Keshab Ch. Bhattacharya, Kakali Pal and Shrabani Banerji

INTRODUCTION

The *Tebhaga* Mmovement has been described as virtually a tribal peasant uprising in wide areas under the Jalpaiguri district, though non-tribal adhiyars also took apart in it. The movement was under the leadership of the *Krishak* Sabha (The Peasants' organization) controlled by the undivided Communist Party of India. The accumulated grudges of the local peasants against generation after generation of deprivation and exploitation culminated in the outbursts of revolt and movement at many places in five districts of North Bengal, at a particular phase of social and political evolution in the third decade of the twentieth century. In the memories of those days as well as in the history of today this rebellion is known as the *Tebhaga* Movement.

OBJECTIVES

The chief objective of this study is to analyses the contribution tribal share-cropper and workers in *Tebhaga* movement in North Bengal during 1940s.

STUDY AREA

The present study is confined within the district of Jalpaiguri. The study area is the north-eastern most district of West Bengal with a total geographical area of 6227 sq. km. between 26°16' to 27°0' N and 88°8' to 89°53' E. It is bordered by two international boundaries viz. Bangladesh in the south-west and Bhutan in the north. Jalpaiguri district is the chicken-neck of the North-East India between Bhutan and Bangladesh.

গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে রবীন্দ্রনাথ ও এই সময়

বেদদ্যুতি বর্মন ও কাকলি পাল

ভূমিকা ঃ

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মূলত একজন মানবতাবাদী। পৃথিবীর ইতিহাসে মানবতাবাদের এত বড় প্রবক্তা খুব কমই এসেছেন। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা শুধু সাহিত্য, সঙ্গীত বা চিত্রকলার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। তাঁর চিন্তাধারা ছিল সুদূরপ্রসারী। রবীন্দ্রনাথের রচনায় মানুষের সঙ্গে—মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গে পরিচয় সুস্পষ্ট। তাঁর কবিসত্তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে সাধারণ মানুষের কল্যাণ করার আকাঙ্ক্ষা। মানুষের কল্যাণ কামনাই ছিল রবীন্দ্রনাথের জীবনের অন্যতম ব্রত। অর্থনৈতিক চিন্তা, তাঁর কবিসত্তার সঙ্গে এমনভাবে জড়িত ছিল যে, তা খুঁজে বের করা খুব কঠিন।

রবীন্দ্রনাথের একটি অর্থনৈতিক চিন্তাধারা ছিল। তিনি ছিলেন একজন মানবতাবাদী। মানবতাবাদী বলেই তিনি বলেছিলেন, "দারিদ্র মানুষের অসম্মিলনে, ধন তার সম্মিলনে"। মানবতাবাদ রবীন্দ্রনাথকে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে ঠেলে দিয়েছিল এবং এক্ষেত্রেই আমরা তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তাধারার মূলসূত্রগুলি দেখতে পাই।

রবীন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক চিন্তার মূলসূত্রগুলি হল—(১) কৃষিক্ষেত্রে উন্নতি এবং কৃষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য পথ নির্দেশ করা, ২) সমবায় আন্দোলনের সম্প্রসারণ, যা কৃষির উন্নতির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত; কৃষকদের প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহ করার জন্য সমবায় ব্যাঙ্ক গঠন এবং কৃষিজাত সামগ্রি ন্যায্য দামে বিক্রি করার জন্য সমবায় বিক্রয়করণ সমিতি গঠন। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রদর্শিত সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার (Community Development Plan) যৌক্তিকতা দেশের পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষও মেনে নিয়েছেন। ৩) শিল্পোন্নয়ন, বিশেষ করে গ্রামীণ শিল্পের পুনরুজ্জীবনে রবীন্দ্রনাথের প্রয়াস।

অর্থবিজ্ঞানে আমরা ছদ্মবেশী বা প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব (Disguised unemployment) কথাটির সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত। এই বেকার অবস্থার বৈশিষ্ট্য হল, কৃষিক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত শ্রমিক কাজে নিযুক্ত থাকে, যাদের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা (marginal productivity) শুন্য। এই উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তিকে যদি খামার থেকে সরিয়ে আনা যায় এবং বিকল্প কাজের ব্যবস্থা করা যায়, তাতে পরিণামে দেশেরই সম্পদ বাড়বে এবং কিছু অনুৎপাদনমূলক ব্যয় (unproductive expenditure) এড়ানো সম্ভব হবে।

রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা অনেকটা ঐরূপ, যদিও তিনি অর্থবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করতে যান নি। তিনি জানতেন ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ কৃষিক্ষেত্র আর সহ্য করতে পারছে না—তাছাড়া সারা বছরের সব সময়েই কৃষকদের হাতে কাজ থাকে না। এজন্য তাদের বিকল্প কর্মসংস্থানের প্রয়োজন যাতে একান্তভাবে কৃষিনির্ভর না হয়ে পরে। এজন্যই রবীন্দ্রনাথ সুরুল গ্রামে ও তার আশেপাশের গ্রামবাসীদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য কুটির ও গ্রামীণ শিল্পগুলিকে পুনর্গঠিত ও উন্নত করার জন্য প্রেরণা দিয়েছিলেন এবং সক্রিয়ভাবে

বহুরূপে সম্মুখে তুমি : বিবেকানন্দ (১২-১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০১৩)
রাণীগঞ্জ গার্লস কলেজ, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ
ISBN : 978-93-84-491-05-5

সামাজিক প্রগতি ও নারী জাগরণের জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবনা

কাকলী পাল ও প্রতিমা মুখার্জী
বাংলা বিভাগ, সংস্কৃত বিভাগ, অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয় সাঁইথিয়া, বীরভূম

ভূমিকা : স্বামীজী কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত পায়ে হেঁটে ভারতবর্ষের মানুষের দুঃখকষ্টের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। তিনি দেখেছিলেন- অশিক্ষা, দারিদ্র, কুসংস্কার প্রভৃতির কারণে একশ্রেণির মানুষ পশুর মত জীবনযাপন করছে। তাদের অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, বাসস্থান নেই, এমনকি নিজেদের প্রতি বিশ্বাসও নেই। অন্যদিকে, আর-এক শ্রেণির মানুষ তাদেরই পরিশ্রমের সম্পদকে অবলম্বন করে চরম বিলাসিতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। স্বামীজী ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্যের অবসান চেয়েছিলেন। একমাত্র শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমেই এই সামাজিক বৈষম্য দূর করা সম্ভব। স্বামীজীর মতে "দেশের জনসাধারণকে অবহেলা করাই আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ এবং তাহাই আমাদের অবনতির অন্যতম কারণ। যতদিন না ভারতের সর্বসাধারণ উত্তমরূপে শিক্ষিত হইতেছে, উত্তমরূপে খাইতে পাইতেছে, অভিজাত ব্যক্তিরা যতদিন না তাহাদের যত্ন লইতেছে, ততদিন যতই রাজনীতিক আন্দোলন করা হউক না কেন, কিছু হইবে না।"

দেশবাসীর দারিদ্রের মূলে অশিক্ষা : স্বামীজীর ভাষায় দারিদ্রের জন্য দায়ী বিশ্ব লোকের 'বিশ্বাসঘাতকতা'। স্বামীজী বলেছেন, ' লক্ষ লক্ষ দরিদ্র নিষ্পেষিত নরনারীর বুকের রক্ত দ্বারা অর্জিত শিক্ষালাভ করে এবং বিলাসিতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত থেকেও যারা ঐ দরিদ্রদের কথা একটিবার চিন্তা করার অবকাশ পায়না-তাদের আমি

বিবেকানন্দ ঃ মানবতার পূজারী

সুমিত ভট্টাচার্য,
সহ অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়, সাঁইথিয়া, বীরভূম

কলকাতার খুব কাছের মফস্বল শহর সিমুলিয়ার বিখ্যাত দত্ত পরিবারের সন্তান স্নাতক নরেন্দ্রনাথ দত্তের উনিশ শতকের আটের দশকে সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণের তাৎপর্য ভারত ইতিহাসে অসীম। পূর্বাশ্রমের নরেন্দ্রনাথ সন্ন্যাসজীবনে পরিচিত হয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ নামে। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ছিলেন প্রথম ভারতীয় যিনি শিকাগোর ধর্মমহাসভায় বিশ্ববাসীর কাছে হিন্দু-সভ্যতা ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্বকে তুলে ধরেছিলেন সুদৃঢ় প্রত্যয়ে। দেশীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে এতকালের হীনমন্যতার ভাবনা ঝেড়ে ফেলে ভারত জেগে উঠেছিল নব উদ্দীপনায়।

নরেন্দ্রনাথ দত্তের স্বামী বিবেকানন্দে রূপান্তর সম্ভব হয়েছিল ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের উদ্যোগ ও সোৎসাহ প্রেরণায়। বিরজা হোম করে রামকৃষ্ণের প্রিয় শিষ্য নরেন গৃহত্যাগ করেছিলেন ধর্মের জন্য। একথা ঠিক যে সেকালের আরও অনেক হিন্দু চিন্তাবিদ ও সংস্কারকের মত বিবেকানন্দও হিন্দুধর্মের মহিমা কীর্তন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর বিশেষত্ব ছিল এই যে, তিনি হিন্দু পুনরুত্থানের তত্ত্বকে পুরাণ বা স্মৃতির ওপর নয়, প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন বেদান্তের ওপর। যে বেদান্তের চিন্তাধারায় পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদের কোনো স্থান ছিল না। সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষা নিলেও চিন্তায় ও কাজে-কর্মে গড়পড়তা সন্ন্যাসীর মত ছিলেন না তিনি। লোকালয় থেকে দূরে গিরিবন্দরে কিংবা শ্মশানের স্তব্ধতার মধ্যে সাধন-ভজনে নিজেকে ব্যাপৃত না রেখে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের সার্থে কাজ করার কথা বলেছিলেন বিবেকানন্দ। তিনি বলতেন ঃ "ক্ষীর-ননী খেয়ে, তুলোর ওপর শুয়ে, এক ফোঁটা চোখের জল কখনও না ফেলে কে কবে বড় হয়েছেন, কার ব্রহ্ম কবে বিকশিত হয়েছে ?"[১] এভাবে প্রকারান্তরে সাধারণ মানুষের মাঝে দাঁড়িয়ে তাদের স্বার্থে কাজ করার কথাই বলেছিলেন বিবেকানন্দ।

বিবেকানন্দ ছিলেন একজন বড় ধর্মাচার্য এবং ধর্মাচার্য হিসেবে তিনি মানুষের গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। কিন্তু ধর্মাচার্যের চেয়েও একজন মানবতাবাদী, মানবসেবায় নিবেদিত প্রাণ মহান পুরুষ হিসেবে তিনি বেশি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। মানবতাবাদে তাঁর পাঠগ্রহণ গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের কাছে। রামকৃষ্ণ পরমহংসের 'জীবকে শিবজ্ঞানে' দেখার পরামর্শে অনুপ্রাণিত বিবেকানন্দ নিপীড়িত দরিদ্র আর্ত মানুষের মাঝে প্রত্যক্ষ করেছিলেন সাক্ষাৎ নারায়ণকে। 'দরিদ্র-নারায়ণ' শব্দবন্ধটির স্রষ্টা তিনিই।

রবীন্দ্রনাথ : স্বাদেশিক ও আন্তর্জাতিক

সুমিত ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথের মুখ্য পরিচয় তাঁর সৃজনশীল সত্তায়। তিনি কবি—বিশ্বকবি। এছাড়াও প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক, ছোটোগল্পকার, গীতিনাট্যকার, গীতিকার, সুরকার এমনকী চিত্রশিল্পীরূপেও অসাধারণ সৃজনী প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন তিনি। এই সৃজনশীল সত্তার বাইরে অন্য এক পরিচয়েও তিনি পরিচিত—তিনি ছিলেন একজন উদার মানবতাবাদীও। আর উদার মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ছিলেন বলেই নিজের মধ্যে স্বাদেশিকতা ও আন্তর্জাতিকতার মেলবন্ধন ঘটানো তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। ভারত তথা বহির্বিশ্বে ঘটে চলা মানবতাবিরোধী কার্যকলাপের তিনি ছিলেন একজন সোচ্চার প্রতিবাদী, তাঁর প্রতিবাদ অবশ্য প্রত্যক্ষ কর্মকাণ্ডে রূপায়িত হয়নি কখনোই, কারণ রোলাঁর কথায়, তিনি ছিলেন সংগ্রামের ঊর্ধ্বে। তথাপি, নৈতিক মানদণ্ডে যা কিছু অশুভ ও অন্যায় সেসবের বিরুদ্ধে এবং যুদ্ধবিরোধী শান্তিবাদী আন্দোলনের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে নিজের কণ্ঠকে আজীবন তিনি বেঁধেছিলেন এক সুরে। পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ, নাৎসিবাদ এবং ফ্যাসিবাদকে মানবতাবিরোধী বলে মনে করতেন তিনি। এগুলোর বিরুদ্ধে জীবনভর তিনি তাই সরব ছিলেন। তাঁর কলম কথা বলত, মানবতাবিরোধী মতাদর্শ ও তার ধ্বজাধারীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মানুষকে জোগাত সাহস ও প্রেরণা। একদা তিনি লিখেছিলেন, "মানবতা সংরক্ষণের যুদ্ধে আমাদের নৈতিক মানদণ্ডই হল সর্বশ্রেষ্ঠ আয়ুধ।...তোমরা (পাশ্চাত্যের জাতিগুলি) বলশালী বলেই আনুগত্যের অধিকারী, বিত্তশালী বলেই শ্রদ্ধার্হ, একথা স্বীকার করে নিয়ে আমরা নিজেদের হীন করতে প্রস্তুত নই।"[১]

মানবতাবিরোধী মতাদর্শ, আন্দোলন ও শক্তির বিরোধিতার সূত্রে রাজনীতি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কলম ধরা, যদিও মানবতাবিরোধী মতাদর্শ ও আন্দোলন সম্পর্কে গভীর বোধ গড়ে ওঠার ঢের আগে তাঁর কৈশোরেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন এমন কিছু কবিতা যেগুলিকে স্বচ্ছন্দেই তাঁর রাজনীতি বিষয়ক রচনার হাতেখড়ি বলা যায়। এগুলিতে একই সঙ্গে ছিল স্বদেশপ্রেমের আবেগ এবং স্বাদেশিক করিকল্পনার বিষণ্ণতাকে প্রতিজ্ঞায় পরিবর্তিত করার উদ্‌যোগ। উদাহরণ হিসেবে ১৮৭৫ এবং ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দুমেলার নবম ও একাদশ বার্ষিক

রবীন্দ্রসাহিত্যে ভারত-ইতিহাসচিন্তা

সুমিত ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক ছিলেন না। ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ কিংবা ইতিহাস রচনাকে তিনি কখনও তাঁর জীবনের লক্ষ্যে পরিণত করেননি। তবে ইতিহাস রচনার লক্ষ্য না থাকলেও তাঁর ইতিহাস বোধ ছিল অত্যন্ত প্রখর। গভীর প্রজ্ঞা, অন্তর্দৃষ্টিও বিশ্লেষণী শক্তির সাহায্যে তিনি ভারত-ইতিহাসের মর্মকথা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন নানাকে এক করা, প্রভেদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলা এবং বাইরের পার্থক্যকে নষ্ট না করে ভিতরের নিগূঢ় যোগকে আবিষ্কার করা ভারত ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য।[১] সাথে সাথে তাঁর এই ধারণাও জন্মেছিল যে ভারতীয় সভ্যতা ইউরোপের সভ্যতার মতো বিরোধমূলক নয়, মিলনমূলক।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ইংরেজ ঐতিহাসিকদের লেখা ভারত-ইতিহাসে দেশের প্রকৃত ইতিহাস নেই। দেশের প্রাচীন ইতিহাসের অনেকটাই যে লুকিয়ে থাকে জাতির মহাকাব্য, পুরাণ ও কিংবদন্তিতে সেই উপলব্ধিও তাঁর হয়েছিল। আজ থেকে একশ বছরেরও বেশি আগে অসামান্য যুক্তিবাদী মন নিয়ে তিনি বলতে পেরেছিলেন ভারতবর্ষের ইতিহাস শুধু রাজনৈতিক উত্থান-পতন এবং রাজারাজড়াদের যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনি নয়, তা সাধারণ মানুষের জীবন, তাদের ভাবনা, ধর্ম ও সংস্কৃতির বিবরণ। সেদিনের তাবড় ঐতিহাসিকদের কাছেও ইতিহাসের এমনতর পরিচয়-ব্যাখ্যান ছিল অভাবনীয়।

রবীন্দ্রনাথের ভারত ইতিহাস সংক্রান্ত ভাবনার প্রত্যক্ষ প্রকাশ ঘটেছে 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' (১৯০২), 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' (১৯১২), 'ভারত-ইতিহাস চর্চা' (১৯২০), 'A Vision of India's History' (১৯২৩) প্রবন্ধগুলিতে। এছাড়াও 'নূতন ও পুরাতন' (স্বদেশ, ১৮৯১), 'পূর্ব ও পশ্চিম' (সমাজ, ১৯০৮), 'কালান্তর' (কালান্তর, ১৯৩৩) ইত্যাদি প্রবন্ধেও তাঁর ইতিহাস সংক্রান্ত নানা ভাবনাচিন্তায় পরিচয় মেলে। রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-সম্পর্কিত রচনাবলী বিশ্বভারতী একটি গ্রন্থে[২] একত্র প্রকাশ করে কবির ইতিহাস-বিষয়ক মনন-ঋদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গিকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। সঞ্চয়নটির মূল রচনাগুলির প্রথমটি অর্থাৎ 'ভারতবর্ষের-ইতিহাস' প্রবন্ধটি যখন ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় তখনও আধুনিক ইতিহাস-বিদ্যার আলোচনার সূত্রপাত হয়নি। প্রথম প্রবন্ধেই ধরা আছে রবীন্দ্রনাথের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিচয় : 'দেশের ইতিহাসই আমাদের স্বদেশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। মামুদের আক্রমণ হইতে লর্ড কার্জনের সাম্রাজ্যগর্বাদগার-কাল পর্যন্ত যে-কিছু ইতিহাস কথা তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে বিচিত্র কুহেলিকা; তাহা স্বদেশ সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টির সহায়তা করে না, দৃষ্টি আবৃত করে মাত্র। তাহা এমন স্থানে কৃত্রিম আলোক ফেলে, যাহাতে আমাদের দেশের দিকটাই আমাদের চোখে অন্ধকার হইয়া যায়'।[৩] ইংরেজ ঐতিহাসিকদের লেখা ভারতবর্ষের ইতিহাস কীভাবে ভারত-ইতিহাসের স্বরূপ আচ্ছন্ন করে অদ্ভুত এক মায়াবী জগৎ গড়ে তোলে অননুকরণীয় ভাষায় রবীন্দ্রনাথ তার বর্ণনা দিয়েছেন: 'সেই অন্ধকারের মধ্যে নবাবের বিলাসশালার দীপালোকে নর্তকীর মণিভূষণ জ্বলিয়া ওঠে,

প্রকৃতিসাধক থেকে কড়ির সাধক : রূপান্তরে বাংলার …

সুমিত ভট্টাচার্য*

বৌদ্ধ সহজিয়া, হিন্দু তান্ত্রিক, বৈষ্ণব সহজিয়া এবং বাউল — এদেশে … ও পথের অনুসারীরা প্রকৃতিসাধক। প্রকৃতি অর্থে নারী। অর্থাৎ … মিথুনাত্মক দেহসাধনায় বিশ্বাসী এরা। বৌদ্ধ সহজিয়া মতের মানুষ … হিন্দু তান্ত্রিকদের অবস্থাটা অবশ্য ততটা খারাপ নয়। কিন্তু বাংলার … বাউলদের বিপুল উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। দুই বাংলা মিলিয়ে … ৫/৬ লাখের কাছাকাছি। হিসেবটা গত শতকের শেষের দিকের।

তবে, যাঁরা নিজেদের 'বাউল' বলে দাবি করেন, তাঁদের … নিখাদ বাউল, তা নিয়ে বাউল-বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সংশয় আছে। … 'বাউল' একটা বর্গ (Generic) নামে পর্যবসিত হয়েছে। কর্তাভজা, … সহজিয়া, জাত-বৈষ্ণব, সাহেবধনী, মতুয়া ও যোগী সম্প্রদায়ের … নিজেদের 'বাউল' বলে পরিচয় দেন। এমনকী 'বস্তুবাদী বাউল' … শক্তিনাথ ঝা-র তথ্যানুসন্ধানে এমনও জানা যাচ্ছে যে, বিদেশিদের … শান্তিনিকেতনকেন্দ্রিক বীরভূমের চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায় … ব্রাহ্মণ, সৈয়দ শ্রেণিভুক্ত মুসলমান এবং সেখানকার অধ্যাপক … অনেকেই আজ নিজেদের বাউল বলেন; যদিও, বিশ্বাস ও আচরণে … বাউল, সে সংশয় থেকেই যায়। আর আছেন বিকল্প জীবিকাসন্ধানী … যাঁরা বিশ্বাস কিংবা আচরণ কোনো দিক থেকেই বাউল নন। অথচ … সাধারণ মানুষের কাছে এঁরাই সত্যিকারের বাউল! পেশাদারী … এঁদেরই কদর। তাই প্রকৃত বাউল কে বা কারা, তা নির্ধারণ … জটিল। তবে কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হলে একজন … যাবে, তা জানা থাকলে, কাজটা অনেকটা সহজ হয়। কিন্তু … ক্ষিতিমোহন সেন, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, … আদিত্য মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বাউল-বিশেষজ্ঞের বিবিধ অভিমত … করে বলা যায়, মনোমন্দিরে প্রাণের ঠাকুর অন্বেষী মুক্তমনা … ঊর্ধ্বে জীবনকে দেখতে অভ্যস্ত আত্মভোলা মানুষরাই হলেন …

বাউল আবার একটা তত্ত্ব বা মত, বাউল একটা পথ, বাউল … প্রচলিত অর্থে ধর্ম বলতে যা বোঝায় বাউল তা নয়। বৌদ্ধ সহজিয়া, … নাথপন্থী, তন্ত্র ও সুফীবাদ মিলেমিশে জন্ম হয়েছে এই মত, পথ ও …

---

* অধ্যাপক, অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়

া ধরিয়া অক্ষর গুণিয়া
ইবে বল!

সন্তানদের বলেছিলেন
তারা যেন তাঁর মতো
।

মেয়েদের লেখা প্রতিটি
খেলা নয়। ভাবি আর
। তফাত। তাতেই তেল

মন্দিরে মন্দিরে নারী
ওয়া হয়, তেমনি সংসার
ভুল চেপে বলতে পারে

বীরভূমে নীলশিল্প
সূচনা অগ্রগতি সমাপ্তি

ড. সুমিত ভট্টাচার্য

একদা আমাদের দেশে উৎপাদিত নীল নামে পরিচিত কৃষিপণ্য এবং তাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা নীলশিল্প এ দেশের এক এক অঞ্চলে গুণমানে ছিল এক এক রকম। প্রক্রিয়াজাত নীলের মান নির্ভর করত কাঁচানীলের মানের ওপর। স্বদেশ কিংবা বিদেশ কোথাওই বীরভূমের নীলের খুব একটা নামডাক ছিল না।[১] তা সত্ত্বেও শ্বেতাঙ্গ নীলকররা এখানেও পণ্যটির চাষে পুঁজি বিনিয়োগ করেছিল ইউরোপ ও আমেরিকায় তার বিপুল চাহিদার কথা মাথায় রেখে। উনিশ শতকে ঐ দুই অঞ্চলের শুধু সামরিক বাহিনীর পোশাকের রংই নীল ছিল না, সেখানকার অসামরিক ব্যক্তিদের মধ্যেও নীল রঙের পোশাক পরাটা একটা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[২] আঠারো শতকের শেষ লগ্ন থেকে উনিশ শতকের প্রায় একশ বছর বীরভূমের নীল ইউরোপে বস্ত্র শিল্পে ব্যবহৃত হয়েছিল। তবে বীরভূমের বাইরে বাংলার বেশ কয়েকটি জেলা এবং ভারতের কয়েটি প্রদেশে উৎপাদিত নীল তুলনামূলকভাবে অনেক উন্নত মানের[৩] হওয়ায় বীরভূমের নীলের চেয়ে সে সব নীলের কদরই ইওরোপে ছিল বেশি। এর আগেও, ষোল এবং সতেরো শতকে, উনিশ শতকের এই নীলের চেয়ে কম উন্নত ভারতীয় নীল ইওরোপের বস্ত্রশিল্পে স্বচ্ছন্দে ব্যবহৃত হয়েছে। সে সময় ইওরোপ তার পরিচিত দুনিয়ায় এর চেয়ে উন্নত মানের নীলের সন্ধান পায়নি বলেই তাকে অনুন্নত নীলেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ভারতীয় নীলশিল্প ও তার ইতিহাস বিষয়ে কয়েকটি প্রাথমিক প্রসঙ্গের অবতারণা কিন্তু এই আলোচনায় এখনও করা হয়নি, যেগুলি সম্পর্কে অবহিত না হলে এই শিল্পটি সম্পর্কে একটি আনুপূর্বিক ধারণা গড়ে ওঠে না। সে কারণে ঐ প্রাথমিক প্রসঙ্গগুলোর উল্লেখের পরই আমরা আলোচনার পরবর্তী অংশে যাব।

বর্তমানে সাদা সুতিবস্ত্র তথা পোশাকে ঔজ্জ্বল্য এবং নীলচে ভাব আনার জন্য কাচা কাপড়ে ব্যবহৃত হয়। সেকালে কিন্তু বস্ত্রে নীল রং করার জন্য এটির ব্যবহার হতো। নীল নামে পরিচিত চারাগাছের নিষ্কাশিত রসকে আগুনে জ্বাল দিয়ে তৈরি হতো যে রং তাই নীল। ভারতে দীর্ঘকাল ধরে সুতিবস্ত্র রং করার

সাঁইথিয়ার কাছারি বাড়ির কর্তা-কথা: তথ্য ও জনশ্রুতির আলোতে

সুমিত ভট্টাচার্য

সাঁইথিয়ার ঘোষ জমিদার পরিবারের জমিদারি দপ্তর এবং বসতবাড়ি একত্রে 'কাছারি বাড়ি' নামে পরিচিত ছিল। এখনকার সাঁইথিয়া থানা থেকে বাসস্ট্যান্ডে যাওয়ার পথে মূল সড়কের [illegible] দিকে তৈরি হয়েছিল বড়ো এবং ছোটো কাছারি বাড়ি। জমিদারি প্রথা এখন আর নেই; কিন্তু [illegible] গেছে সেই কাছারি বাড়ি; আছেন নতুন প্রজন্মের কাছারি বাড়ির বাসিন্দারাও। সাঁইথিয়ার [illegible] পরিবারের জমিদারি হেতমপুরের চক্রবর্তীদের জমিদারির মতো বৃহৎ ছিল না। এমনকী শ্রীনিকেতনের সুরুল সরকার পরিবারের জমিদারিও ঘোষ পরিবারের জমিদারির চেয়ে আয়তনে বড়ো [illegible] তবে ক্ষুদ্র, মাঝারি কিংবা বৃহৎ জমিদারির আয়তন যাই হোক না কেন, প্রতিপত্তি এবং দাপটে [illegible] মালিকদের কেউই একে অন্যকে টেক্কা দেওয়ার চেষ্টায় কোনওরকম কসুর করতেন না। সাহি[illegible] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা 'আমার কালের কথা'য় বীরভূমের জমিদার[illegible] বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লিখেছেন, "বীরভূমে জমিদারের একটা বৈশিষ্ট্য হল জমিদারির আয়তন [illegible] আয়ের ক্ষুদ্রতা এবং তাঁদের সংখ্যার বাহুল্য।...চাষের জমির সঙ্গে পঞ্চাশ থেকে পাঁচশ [illegible] টাকা বাৎসরিক আয়ের জমিদার অনেক। হাত-পায়ের আঙুলে গোণা যায় না। তাঁদের পরাক্রম [illegible] নয়।" বীরভূমের জমিদার ও জমিদারি নিয়ে তারাশঙ্করের এই মন্তব্য সময়ের বিচারে উনিশ [illegible] ও মধ্য বিংশ শতাব্দী সম্পর্কিত। অথচ আঠারো শতকের নব্বইয়ের দশকের সূচনা পর্যন্ত বী[illegible] ছিল একটিমাত্র জমিদার পরিবার—রাজনগরের পাঠান রাজবংশের শাসনাধীনে। ছবিটা [illegible] যায় ১৭৯৩-এ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূচনা এবং সেই বন্দোবস্তের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিক্রয় আই[illegible] সূর্যাস্ত আইনের কঠোর প্রয়োগের ফলশ্রুতিতে। নগররাজ তাঁর প্রদেয় সদর খাজনা দিতে ক্র[illegible] ব্যর্থ হতে থাকায় বিক্রয় আইন মোতাবেক অনাদায়ী খাজনার দায়ে ব্রিটিশ সরকার তাঁর জমি[illegible] অসংখ্য লাটে খণ্ডিত করে নীলামে বিক্রি করে দেয়।[২] এভাবেই জেলায় উদ্ভূত হয় নতুন [illegible] জমিদারের। নব্য জমিদারদের অনেকেই আবার সূর্যাস্ত আইনের মর্মার্থ উপলব্ধি করতে না [illegible] তাঁদের জমিদারিও পুনরায় খণ্ডিত করে নীলামে অসংখ্য নতুন মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হ[illegible] অন্যদিকে সাধ্যাতিরিক্ত খাজনা কোম্পানি সরকারে জমা দেওয়ার অঙ্গীকারে নীলামে জমি[illegible] বন্দোবস্ত নেওয়া জমিদারদের অনেকেই তাঁদের জমিদারি মহালের অন্তর্ভুক্ত লাটগুলির খা[illegible] সব কিস্তি নির্দিষ্ট সময়ে জমা দিতে পারতেন না। যার অনিবার্য পরিণতি ছিল জমিদারি মহাল[illegible] পুনরায় খণ্ডীকরণ এবং নীলামে নতুন নতুন ব্যক্তির কাছে সেগুলির হস্তান্তর।[৪] জমিদারি মহা[illegible] এই পুনঃপুন খণ্ডীকরণ ও হস্তান্তর চলতে থাকে সমানেই। ফল, জমিদার ও জমিদারির সং[illegible] উত্তরোত্তর বৃদ্ধি। জমিদারের সংখ্যায় এই বিপুল বৃদ্ধির কারণে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে বীরভূম জে[illegible] জমিদারদের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৩৩।[৫] সংখ্যাটা নিঃসন্দেহে চোখে পড়ার মত।

বীরভূম জেলায় আঠারো শতকের নব্বইয়ের দশকে যাঁরা জমিদারি কিনেছিলেন সূর্যাস্ত [illegible] এবং বিক্রয় আইনের মর্মার্থ অনুধাবন করতে না পারায় তাঁদের প্রায় সকলের জমিদারিই নী[illegible] উঠেছিল, তাঁরা সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন। কিন্তু উনিশ শতকের নব জমিদারদের অনেকেই আ[illegible] জমিদারদের দুর্দশা থেকে দ্রুত শিক্ষা নিয়ে নিজেদের জমিদারি রক্ষা করার যাবতীয় কলা-কৌশ[illegible] রপ্ত করে নিতে পেরেছিলেন। সাঁইথিয়ার ঘোষেরা ছিলেন এই নব জমিদারদেরই সার্থক প্রতি[illegible]

[illegible] বছরেরও অধিক কাল ধরে বীরভূম জেলায় তাঁরা [illegible]
[illegible] হয়েছিলেন তাই নয়, তাঁদের জমিদারির আয়তন[illegible]
[illegible] বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ, দুরবর্তী হুগলি এবং ২৪ পর[illegible]
[illegible] কাশীধামেও তাঁদের জমিদারি বিস্তৃত হয়েছিল।[৬] [illegible]
[illegible]মে জমিদারি স্বত্বে স্বত্ববান হয়েছিলেন তাঁদের [illegible]
[illegible]।[৭]

[illegible]২০৭ বঙ্গাব্দে রামচন্দ্র ঘোষ লাট সাইতা, বেলে, [illegible]
[illegible] সাঁইথিয়ায় ঘোষ পরিবারের জমিদারির সূত্রপাত করেন
[illegible] জমিদারি কিনেছিলেন তাঁদের অধিকাংশ এই জেলার
[illegible] তাঁরা এখানে বসবাস করছিলেন। ব্যতিক্রমীদের ম[illegible]
[illegible]রের আড়িয়াদহে ছিল তাঁদের আদি নিবাস।[৮] [illegible]
[illegible] থেকে রামচন্দ্র বীরভূমে এসেছিলেন স্কটিশ সা[illegible]
[illegible] দেওয়ান নিযুক্ত হয়ে।[৯] খুব সম্ভব এটি ছিল আঠারে[illegible]
[illegible] বছর পর ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে তিনি সাঁইথিয়া ও সংল[illegible]
[illegible] জনশ্রুতি এই যে, সাঁইথিয়া অঞ্চলে সেকালের স্থানী[illegible]
[illegible] কিনেছিলেন। গনুটিয়ার কুঠিয়াল সাহেবের স[illegible]
[illegible] পদে তাঁর নিযুক্তি, তাঁকে দেবী নন্দিকেশ্বরীর স্বপ্না[illegible]
[illegible] ক্রয় ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে সাঁইথিয়া এবং [illegible]
[illegible] ফেরে। সন্দেহ নেই যে, জনশ্রুতি দুটির জন্ম হয়ে[illegible]
[illegible] দেওয়ান পদে নিযুক্তি সংক্রান্ত জনশ্রুতিটি[১০] [illegible]
[illegible] নৌকো[১১] আটকে গেলে সেসময় গঙ্গার [illegible]
[illegible] সাহেবের ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর সাহায্যার্থে এ[illegible]
[illegible] জলে ভাসাতে মাঝি-মাল্লাদের সাহায্য করেন। এ[illegible]
[illegible] তাঁর নীলকুঠির[১২] দেওয়ান পদে নিযুক্ত ক[illegible]
[illegible] না কেন, এটির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে যুক্তিবাদী ম[illegible]
[illegible] আর দেওয়ানের গুরুদায়িত্ব পালনে বুদ্ধি [illegible]
[illegible] আর সে কারণেই বালির ফাঁসে আটকে যাও[illegible]
[illegible] দেওয়ান পদে নিযুক্তি হতে পারে না [illegible]
[illegible] ইতিহাসের তথ্য কখনো সখনো তাতে [illegible]
[illegible]তে রামচন্দ্র গনুটিয়ার রেশমকুঠির দে[illegible]
[illegible] পাওয়া না গেলেও অনুমান করা যা[illegible]
[illegible] কাজ পছন্দ না হওয়ায় তিনি য[illegible]
[illegible] সঙ্গে কলকাতায় তাঁর সাক্ষাৎ। ফ্রুসার্ড[illegible]
[illegible] উপলক্ষ্যে কলকাতায় অবস্থান কর[illegible]
[illegible] এই ব্যক্তিই তাঁর গনুটিয়ার রেশ[illegible]
[illegible] তিনি অতঃপর রামচন্দ্রকে তাঁর রেশম[illegible]
[illegible] সানন্দে সম্মতি দেন। আড়িয়াদহে[illegible]

সু মি ত ভ ট্টা চা র্য

জমিদারনামা:
প্রসঙ্গ আঠারো ও উনিশ শতকে বীরভূমের জমিদারদের সাতসতেরো

জমিদার নামে পরিচিত এদেশে একসময় অস্তিত্বশীল আর্থ-সামাজিক এবং মুসলমান শাসনকালে কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রতিপত্তির অধিকারী শ্রেণিটি আজ ইতিহাসের গর্ভে লীন। ১৯৫৩ সালে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে ভারতে এই শ্রেণিটির অবলুপ্তি ঘটেছে। কিন্তু রয়ে গেছে তাঁদের দুষ্কৃতী আর সুকৃতির ইতিহাস।

ইতিহাসের তথ্যপঞ্জিতে বীরভূমের জমিদারি শাসনের সূচনাকাল খুব স্পষ্ট নয়। শেরশাহের সিংহাসন লাভের আগে এবং পরে বাংলার প্রায়-স্বাধীন পাঠান শাসকেরা সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বীরভূমে বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁদের যেসব অনুচরদের বসিয়েছিলেন, খুব সম্ভবত তাঁরা জমিদার নয়, ছিলেন জায়গিরদার। যে নগররাজদের আমলে বীরভূমে জমিদারি শাসনের সূত্রপাত হয়েছিল বলে মনে করা হয়, তাঁদের শাসনের শুরু সতেরো শতকের সূচনায়, উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে আগত জোনেদ খাঁ নামে জনৈক ভাগ্যান্বেষী পাঠানের হাত ধরে। রাজনগরের হিন্দু শাসক কোনো এক বীররাজার অধীনে কর্মরত এই জোনেদ খাঁ তাঁর প্রভুকে হত্যা করে পশ্চিম বীরভূমে নগররাজ বংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে। তবে জোনেদের শাসনকাল ছিল অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। বীররাজাদের কাছ থেকে ক্ষমতা দখলের কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয় (১৬০০ খ্রিঃ)। নগররাজপরিবারের কুর্শিনামায় এই বংশের প্রথম 'রাজা' হিসেবে জোনেদ খাঁর কিন্তু কোনো স্বীকৃতি নেই, আছে তাঁর ছেলে বাহাদুর খাঁ ওরফে রণমস্ত খাঁর নাম। বীরভূমের পশ্চিমাঞ্চল থেকে বীররাজাদের উৎখাত করার জোনেদের কৃতিত্ব বাংলার মুঘল শাসনকর্তার চোখ এড়ায়নি। পাঠানদের বিরুদ্ধে কঠিন এক লড়াইয়ে জিতে সে বছরই (১৬০০ খ্রিঃ) মুঘলরা দীর্ঘ প্রায় দু'দশক পর পূর্ব বীরভূমের ওপর তাদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। মুঘল বিরোধী স্থানীয় পাঠান শক্তির পুনরভ্যুদয়ের সম্ভাবনা তখনো কিন্তু পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়নি। এই অবস্থায় তাদের পুনরাক্রমণ প্রতিহত করার কৌশল হিসেবে জোনেদ খাঁকে মুঘল মিত্রে পরিণত করে তাঁর হাতে সমগ্র বীরভূমের শাসন দায়িত্ব অর্পণ করার ভাবনা এসেছিল মুঘল সুবেদারের মাথায়। তাছাড়া ঝাড়খণ্ড থেকে বীরভূমের মধ্যে দিয়ে বাংলার বুকে ধেয়ে আসা দুর্দান্ত পার্বত্য উপজাতিদের আক্রমণ ঠেকানোর লক্ষ্যে বীরভূমের পশ্চিমাঞ্চলে শক্তিশালী এক স্থানীয় শাসনকর্তার নিযুক্তির পরিকল্পনাও করেছিলেন মুঘল সুবাদার। মুঘল শাসকের পরিকল্পনা কার্যকর হয় জোনেদের ছেলে রণমস্ত খাঁ-র আমলে। মুঘল শাসনকর্তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন এবং তাঁকে কর

প্রদানের শর্তে রণমস্ত খাঁ বীরভূমের ফৌজদা
পরে কখনো, বীরভূমের জমিদার হিসেবেও
সুবাদার স্বীকৃত বীরভূমের প্রথম জমিদার হওয়
'রাজা' হিসেবে স্বীকৃত। রাজনগরের হিন্দু
উত্তরাধিকার বহন করার কারণেই সম্ভবত রাজ
নামে অভিহিত করতেন। আবার 'রাজা' শব্দে
পাঠান শাসকেরা বাস্তবে ছিলেন বৃহৎ জমি
নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকতে পারেন। তবে
ছিলেন বদি-উজ-জমান খাঁ (১৭১৮-৫২), যিনি
স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর-র

একাদিক্রমে প্রায় দু'শো বছর নগররাজেরা
১৭৯০ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সর
মহম্মদ-উজ-জামান খাঁ, বাংলার আর দশটা
দশসালা বন্দোবস্তে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে রূপান্তরিত হয়েছিল।
বন্দোবস্তে আসার দু'বছরের মধ্যেই জেলার
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্তর্ভুক্ত বিক্রয় আইনের
জমিদারি ভেঙে পড়ে। কোম্পানি বিক্রয় আইন
জমিদারি মহালগুলি বহু লাটে খণ্ডিত করে সেগুলি
করেছিল। কোম্পানি কৃত এই নীতি অনুসারে নি
'জমিদার' মর্যাদার অধিকারী হতেন। নগররাজে
এভাবেই গজিয়ে ওঠে ছোটো-বড়ো অসংখ্য জমি

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পাল্টে দেয় বীরভূম জে
জমিদার পরিবারের একাধিপত্যের জায়গায় জে
আধিপত্য। নবোদিত এই জমিদারদের শ্রেণিচরিত্র
থেকে সম্পূর্ণই ছিল আলাদা। আগের জমিদার ছিলে
দুঃসময়ে তাদের খাজনায় ছাড় দিতেন তাঁরা, প্রাকৃ
রাখতেন খাজনা আদায়। ধর্মকর্ম শিক্ষায় দান করে
অন্যদিকে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা নূতন জমিদারদের এ
যতটা সম্ভব বেশি খাজনা আদায় করা। প্রজাহিতে
করতেন। যদি কখনও কৃষক-প্রজার স্বার্থে অর্থব
আবওয়াবের (অতিরিক্ত কর/সেস) আকারে কড়ায়-
হত না। জীবনযাত্রার ঢঙে নবোদিত বৃহৎ জমিদারর
রাজা-বাদশা। তবে বীরভূম জমিদারদের এই সব সাত

বীরভূমের জনজাতি প্রসঙ্গ

সুমিত ভট্টাচার্য

Add

প্রাক্-কথন

বাংলায় 'জনজাতি' শব্দটির ব্যবহার খুব বেশিদিনের নয়। ইংরেজি শব্দ 'Tribals'-এর পরিভাষিত রূপ হচ্ছে 'জনজাতি'। আগে বাংলা ভাষায় 'Tribals' বোঝাতে প্রথমে 'উপজাতি' এবং পরে 'আদিবাসী' শব্দের ব্যবহার হত। 'আদিবাসী' শব্দটির ব্যবহার অবশ্য এখনও ব্যাপক। তবে 'উপজাতি' শব্দটির প্রয়োগ সরকারি নথিপত্রের বাইরে ক্রমশ কমছে। কারণ 'Tribal' অর্থে এই শব্দটির প্রয়োগে কারো কারো আপত্তি আছে। যাঁরা 'উপজাতি' শব্দটি অপছন্দ করেন, তাঁদের মতে শব্দটি ট্রাইবাল জনগোষ্ঠীগুলির পক্ষে অবমাননাকর। তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন, 'উপ' বলতে কার অধীন বোঝানো হচ্ছে ? আদিবাসীরা তো হিন্দু জাতিব্যবস্থার (Caste System) অধীন নন ! তাঁদের আরও অভিযোগ, 'উপ' পূর্বপদ ব্যবহার করে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে যাঁরা ব্রাহ্মণ্যবাদী জাতিব্যবস্থায় এখনো প্রবেশ করেননি তাঁরা নিচু, বর্বর, অধীন থাকার বা বড়জোর করুণা পাওয়ার যোগ্য।"[১] 'উপজাতি' শব্দ ব্যবহারের বিরুদ্ধবাদীদের উপরোক্ত বক্তব্যটি অবশ্যই বিতর্কিত। 'উপ' এই উপসর্গটির একটি অর্থ 'সদৃশ'। সেই দিক থেকে দেখলে, 'উপজাতি' শব্দটির অর্থ হল, 'জাতি সদৃশ সামাজিক বিভাগের অন্তর্গত জনগোষ্ঠী।' আর এভাবে দেখলে শব্দটিকে কখনোই অসম্মানসূচক বলে মনে হবে না। আসলে, শব্দের অর্থের এই যে ফেরবদল, তা ঘটে, এক ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে অন্য ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের কারণে। অন্যদিকে 'Tribals' অর্থে 'আদিবাসী' শব্দটির ব্যবহার সবক্ষেত্রে যথার্থ কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে। কারণ, 'আদিবাসী' শব্দটি দিয়ে শুধুমাত্র সাঁওতাল, কোড়া, ওরাওঁ, মুণ্ডা প্রভৃতি ট্রাইব'দেরই বোঝায় না, বোঝায় হাড়ি, বাগদি, বাউড়ি, ডোম প্রভৃতি বাংলার প্রাচীন জনগোষ্ঠীগুলিকেও, যাঁরা ছিলেন বাংলার এক-একটি অঞ্চলের আদি বাসিন্দা।[২] কোনো এক সময়ে তাঁরাও ট্রাইবাল ঐতিহ্যের অধিকারী ছিলেন বলে মনে করা হয়। পরে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি গ্রহণ করায় হিন্দুসমাজের তথাকথিত অন্ত্যজ পর্যায়ে এই জনজাতিগুলির স্থান হয়। পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে না গেলে তাই, 'আদিবাসী' শব্দটির তাৎপর্য বোঝা যাবে না। ইদানীংকালে 'Tribals' বোঝাতে 'আদিবাসী'র স্থলে 'জনজাতি' শব্দের চল লক্ষ করা যাচ্ছে। 'আদিবাসী'

বীরভূমের সাঁওতাল জনজাতি : ঔপনিবেশিক শাসনে দারিদ্র্যে বিপর্যস্ত জীবন ও জীবিকা

ড. সুমিত ভট্টাচার্য
এ্যাসোশিয়েট প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ
অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয় : সাঁইথিয়া, বীরভূম

সাঁওতাল জনজাতিটি বীরভূমের আদি বাসিন্দা নয়। পণ্ডিতদের ধারণা, সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর যে অংশটির সঙ্গে বীরভূমবাসীর প্রথম পরিচয়, তারা এসেছিল ঝাড়খণ্ডের রাজমহল পাহাড় ও সংলগ্ন অরণ্যভূমি থেকে।[১] পরবর্তীতে ভাগলপুর ও সাঁওতাল পরগণার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তাদের অনেকে এ জেলায় অভিবাসী হয়েছিল।[২] বিশ শতকে মনে করা হতো, বীরভূমে সাঁওতালদের প্রথম পদার্পণ আঠারো শতকের শেষ লগ্নে। প্রচলিত সেই ধারণা অনুসারে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে (১৭৯৩ খ্রিঃ) সদর খাজনার পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত হওয়ায়, বীরভূমের জমিদাররা নিজ নিজ জমিদারির আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের জমিদারিভুক্ত জঙ্গলাকীর্ণ জমিগুলিকে কৃষির উপযোগী করে তুলতে সাঁওতালদের এই জেলায় ডেকে এনেছিল। কিন্তু ঐতিহাসিক সাক্ষ্যপ্রমাণ সহযোগে বীরভূম-গবেষক রঞ্জন গুপ্ত দেখাতে চেয়েছেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্তত দু'দশক আগে তারা বীরভূমে এসেছিল। বীরভূমের একক জমিদার তখন রাজনগরের নগররাজ পরিবার। তাদের জমিদারির অন্তর্গত ননী, মল্লারপুর ও মৌড়েশ্বর পরগণার মালগুজারি জমিগুলোর অনাদিবাসী স্বত্বাধিকারীদের বিতাড়িত করে আগন্তুক সাঁওতালরা সেগুলির দখল নিয়েছিল।[৩] তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কয়েক দশক আগে এলেও, ১৭৯০-এর দশক থেকে বীরভূমে অভিবাসী সাঁওতালদের সংখ্যায় যে ক্রমিক বৃদ্ধি ঘটেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আর এটা ঘটেছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলশ্রুতিতেই।

বীরভূমের প্রবেশের পর পর্বত ও অরণ্যবাসী সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর এই

অংশটি সম্ভবত প্রথম এক স্থায়ী কৃষিভিত্তিক সমাজের সংস্পর্শে এসেছিল। কিন্তু এখানে তাদের হাসিল করা জমির ওপর জমিদারদের খাজনার দাবি তাদের যারপরনাই বিস্মিত করেছিল। সাঁওতাল-চেতনায় অরণ্য, অরণ্য সম্পদ ও জমি হলো প্রকৃতির দান এবং সেগুলি তাই সর্বসাধারণের সম্পত্তি। আর যা সর্বসাধারণের সম্পত্তি তার জন্য তারা খাজনা দেবে কেন! জঙ্গল জমি পড়ে থাকতে দেখলে কারো সম্মতি ছাড়াই জঙ্গল সাফ করে তারা কৃষির পত্তন করত, গড়ে তুলত তাদের বসতি; যেমন গড়ে তুলেছিল, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালিন্দী' উপন্যাসে, চক-আফজলপুর গ্রামের কাছে ব্রাহ্মণী নদীর চরে কমল মাঝির নেতৃত্বে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের লোকজন। কার অনুমতিতে তারা সেখানে বসেছে—জমিদার ইন্দ্র রায়ের এ প্রশ্নের উত্তরে কমল মাঝি অম্লান বদলেন বলেছিল, 'কাকে বুলব? দেখলম জঙ্গল জমি, পড়ে রয়েছে, বসে গেলম।'[৪] উপন্যাসে চরের প্রকৃত মালিককে কমল মাঝিরা কোনো ওজর ছাড়াই খাজনা দিয়েছিল। বীরভূম-ইতিহাসের সাঁওতাল কুশীলবরাও এ ব্যাপারে ভিন্ন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেনি। আসলে তারা বুঝেছিল, জমিদার শক্তিমান, তারা খাজনা না দিলে হাসিল করা জমি থেকে জমিদারের লোকজন তাদের তুলে দেবে, নতুন কোনো জঙ্গল জমিও হাসিল করতে দেবে না। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও, সাঁওতালরা শেষ পর্যন্ত জমিদারকে খাজনা দিতে রাজি হয়েছিল। কিন্তু তাদের বোধে জমিদার আরোপিত সেই খাজনার পরিমাণ হবে যত্সামান্য; আর একবার নির্ধারিত হয়ে গেলে তা বাড়ানো যাবে না কখনও।

কিন্তু তাদের ভাবনার সঙ্গে জমিদারদের ভাবনার অঙ্ক মিলবে কেন? তাই জমিদাররা প্রথমে নামমাত্র কিংবা বিনা খাজনায় সাঁওতালদের জঙ্গলাকীর্ণ জমি হাসিলের অধিকার দিলেও পরে জমি যতই জঙ্গলমুক্ত হতো, ততই বাড়তে থাকত সাঁওতাল রায়তদের ওপর জমিদারদের খাজনা বৃদ্ধির চাপও।[৫]

সাঁওতাল সমাজের প্রথা অনুসারে, তাদের সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গে বহির্জগতের যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যম ছিল মাঝি। গ্রামের সব সদস্যের তরফে সামগ্রিকভাবে জমির বন্দোবস্ত নিত সেই। খাজনা নিয়ে মাঝির সঙ্গেই জমিদারের বোঝাপড়া হতো। অন্যদিকে, সাঁওতাল রায়তরাও, ব্যক্তিগতভাবে নয়, সমষ্টিগতভাবে, তাদের গ্রামপ্রধান বা মাঝির মাধ্যমে জমিদারকে খাজনা দিত।[৬]

জমিদারের বর্ধিত খাজনার দাবি মানতে মাঝি ও তার নেতৃত্বাধীন সাঁওতালদের ছিল ঘোর আপত্তি। মান্ধতার আমলের কৃষিযন্ত্রপাতির সাহায্যে চাষ করে যে পরিমাণ ফসল তারা ঘরে তুলত, তাতে খাজনা দেওয়াটাই ছিল তাদের কাছে

Wesleyan Journal of Research, Vol 8. 1 (June, 2015) ISSN : 0975-1386

Empowerment of Indian Women - Needs, Problems and Solutions

Aparna Ghosh
Assistant Professor of Philosophy, Abhedananda Mahavidyalaya, Sainthia, Birbhum

Now-a-days the issue of empowerment of women is a popular slogan. It has gained prominence in recent times. Many many articles, essays, research papers on this subject have been being published in different newspapers, magazines and journals. It is a matter of discussion and debate in academic circles and judiciary. So, first of all, we should know the meaning of empowerment. Empowerment is a process by which the most insecure person can raise voice on many issues for his/her security and can fight against the social systems which deprive him/her of liberty and rights. It is a continuous process to achieve the objectives of equality for all, liberty and emancipation of men.

Need for empowerment of women :

Empowerment of women is a pressing necessity. Women are human species like men and consist of almost fifty percent of the population of the world. No society, Country, nation can develop and prosper without the all round development of women. The great monk Swami Vivekananda had felt the necessities of progress of Indian men & women equally for the all round development of India. In his words, "There is no chance of welfare of the world unless the condition of women is improved. It is not possible for a bird to fly on only one wing".

He traces the downfall of India to the continued neglect of our women and of our masses. 'In India there are two great evils', says he, ' trampling on the women, and grinding the poor through caste restrictions'. Emancipation of women and uplift of the masses formed the two most important items in Swami Vivekananda's programme of national regeneration.

In this context I want to give you a picture of Indian women in the Nineteenth century, as Swamiji acted as a social reformer during the latter half of that century. In the 19th century, Indian women lived a very miserable life. The door of education and freedom had remained completely closed to them and their way of life was confined merely to performing traditional customs and rituals. Indian social reformers of the 19th century who were committed to the cause of welfare of Indian women had started their mission which was directed in the following three directions. Firstly: expansion of female education, Secondly: progress of women's lot and Thirdly: removal of social taboos.

Indian women must remember outstanding contributions made by Pandit Iswar Chandra Vidyasagar, Raja Rammohan Roy and Brahmo Samaj also to the upliftment of Indian women. Even then, the notion of these great personalities and the said organizations on female education and freedom of women were incomplete. True meaning of women's education and women's freedom had been reflected in the ideas and thoughts of only one great monk who is no other than Swami Vivekananda. In this context, we may quote Pandit Jaharlal Nehrue, our first Prime Minister as saying. "You can tell the condition of the nation by looking at the status of women".

The conditions & problems of women in our society :

The conditions of our women, particularly in rural area, beggars description and they live admist of

International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-I, Issue-III, November 2014, Page No. 21-37
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

ভারতীয় ন্যায়নুমানের সঙ্গে পাশ্চাত্য ন্যায়নুমানের তুলনামূলক আলোচনা

ড. অপর্ণা ঘোষ

ভারতী গ্রন্থবিভাগ,

সহকারী অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ, অভোদানন্দ মহাবিদ্যালয়, সাঁইথিয়া, বীরভূম পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

In the short treatise on "Comparative studies between Indian and Western Inference", the matters relating to nature, characteristics, construction and classification of the Indian and Western Inference have been discussed in brief. There is some similarities and dissimilarities between the explanation about the notion of inference given by the Indian and Western Philosophers. In this paper I have discussed whole matter in detail. This article has written for those who are less familiar with Indian and Western Inference and if they are enriched to some extent on those issues by going through it, then this little endeavor will be successful.

Keywords: Western Inference, Indian Inference, Indian and Western Philosophers

চার্বাক ভিন্ন প্রত্যেক ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ই অনুমানকে স্বতন্ত্র প্রমান রূপে স্বীকার করিয়াছেন। অন্যান্য দর্শনে

ন্যায়মতের সমর্থন করিয়া বলা হইয়াছে যে,অনুমান হইল প্রত্যক্ষের পরবর্তী প্রমাণ। পঞ্চম ন্যায় সূত্রে অনুমান প্রমাণের আলোচনা প্রসঙ্গে ন্যায়সূত্রকার মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন - "অথ তৎপূর্বকং ত্রিবিধমনুমানং পূর্ববচ্ছেষবৎ সামান্যতোদৃষ্টঞ্চ"।[১]

উক্ত সূত্রে মহর্ষি গৌতম "অথ" শব্দের দ্বারা প্রত্যক্ষ প্রমাণ নিরূপণের অনন্তরই তাহার কার্য্য অনুমান প্রমাণের নিরূপণ সঙ্গত - ইহাই বুঝাইয়াছেন। প্রত্যক্ষ জ্ঞান উপজীব্য অর্থাৎ কারণ এবং অনুমিতি জ্ঞান উপজীবক অর্থাৎ কার্য্য। প্রত্যেক্ষের জ্ঞান ব্যতীত অনুমানের জ্ঞান হইতে পারে না। জ্ঞান দ্বয়ের মধ্যে কার্য্য কারণ ভাব রহিয়াছে। কারণ পূর্বে থাকে, কার্য্য পরে থাকে। পূর্বে প্রত্যক্ষ পরে অনুমিতি।

অনুমানের দ্বিবিধ অর্থ। 'অনুমান' শব্দটি কোন সময় অনুমান প্রমাণ এবং কোন সময় অনুমান প্রমাণের ফল অনুমিতিকে বুঝাইয়া থাকে। করণ বাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয়সিদ্ধ 'অনুমান' শব্দের দ্বারা বুঝা যায়- অনুমানপ্রমাণ। ভাবার্থে ল্যুট্ প্রত্যয় সিদ্ধ অনুমান' শব্দের দ্বারা বুঝা যায় অনুমিতরূপ জ্ঞান। যদিও অনুমান প্রধানতঃ করণবাচ্যে ব্যবহৃত হয় তবুও এই পদের ভাবার্থে প্রয়োগ অপ্রসিদ্ধ নহে। মহর্ষি গৌতম অনুমানের লক্ষণে বলিয়াছেন - "অথ তৎ পূর্বকম অনুমানম"।

এখানে 'অনুমান' শব্দটি অনুমিতি অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। অনুমান কারণ, অনুমিতি হইল অনুমানের ফল বা কার্য্য। অনুমান প্রমাণ, অনুমিতি প্রমা। প্রমিতি করনত্বই হইল প্রমাণের লক্ষণ। অনুমিতি প্রমিতির কারণ হইল অনুমাণ প্রমাণ। প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা কোন পদার্থ বিষয়ক জ্ঞান বোধিত হইবার তৎ সম্বন্ধী অন্য পদার্থ বিষয়ক জ্ঞানই অনুমিতি। অনুপূর্বক 'মা' ধাতু অনট্ প্রত্যয় করিয়া অনুমান পদটি সাধিত হয়। "অনু" এই উপসর্গটি এখানে "পশ্চাৎ" অর্থে ব্যবহৃত "মা" ধাতুর অর্থ জ্ঞান। হেতু জ্ঞান, হেতু ও সাধ্যায় ব্যাপ্তি জ্ঞান প্রভৃতির পর যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার নাম অনুমান। হেতুজ্ঞান, ব্যাপ্তি জ্ঞান, প্রত্যক্ষ মূলক জ্ঞান। ঐ প্রত্যক্ষ মূলক হেতু প্রভৃতির জ্ঞানকে ভিত্তি করিয়া যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে অনুমান বলা হইয়া থাকে।

অনুমানের তিনটি পদ থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, "পর্ব্বতঃ বহ্নিমান ধুমাৎ"- এই অনুমানের তিনটি পদ রহিয়াছে। এই অনুমানের পক্ষ পদ হইল পর্বত, সাধ্যপদ হইল বহ্নি, হেতু পদ হইল ধূম। নিম্নে এই তিনটি -পদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল।

(১) পক্ষপদঃ- প্রাচীন ন্যায়মতে "সন্দিগ্ধ সাধ্যবান্ পক্ষঃ" অর্থাৎ যে ধর্মীতে বা অধিকরণে সাধ্যের সন্দেহ হয়, তাহাকে পক্ষ বলা হয়। এইজন্য প্রাচীনেরা বলিয়াছেন - "তত্র নানুপলব্ধে ন নিণীতে অর্থে ন্যায়ঃ প্রবর্ততে, কিংতর্হি সংশয়িতে অর্থে"[২] অর্থাৎ যে বস্তু সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, তাহার সিদ্ধির জন্য ন্যায় (প্রতিজ্ঞানি বাক্য সমুদয়) প্রবৃত্ত হয় না। যে বস্তুটির সংশয় বিষয়িভূত, সন্দিগ্ধ, তাহার সিদ্ধির জন্য ন্যায় প্রবৃত্ত হয়।

মধ্যযুগের সমাজ সংস্কারক—
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ড. অপর্ণা ঘোষ

"চতুর্দিকে লোক ধায় গ্রহণ দেখিয়া
গঙ্গাস্নানে হরি বলি যায়েন ধাইয়া॥
যার মুখে জন্মেও না বোলে হরিনাম।
সেই হরি বলি ধায় করি গঙ্গাস্নান॥"

৮৯১ সনে, ১৪৬০ শকাব্দে, ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে ফাল্গুন মাসে দোলপূর্ণিমার দিনে সন্ধ্যাবেলায় চন্দ্রগ্রহণ আরম্ভ হয়েছে। এমন সময় দলে দলে লোক হরিধ্বনি করতে করতে গঙ্গাস্নানে চলেছে। এমন সময় অতি শুভক্ষণে চতুর্দিকে হরিধ্বনির মধ্যে নবদ্বীপ আলো করে জন্মগ্রহণ করলেন এক মহামানব শ্রী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যকে কেহ শ্রীকৃষ্ণ অবতার বলেন, কেহ বলেন রাধাকৃষ্ণের সম্মিলিত অবতার, কেহ বলেন শ্রী চৈতন্য মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তিবাদ প্রচারক, কেহ বলেন তিনি স্বয়ং ভগবান, কেহ বলেন তিনি মধুর ভাব, কেহ বলেন তিনি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য স্থাপক। যাই হোক আমার মনে হয় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ বিপ্লবী। হিন্দু সমাজের নিদারুণ সংকটময় অবস্থায় সনাতন ধর্মের সংরক্ষণ ও প্রচারের জন্য এবং অজ্ঞ, দীন-দুঃখী, জনসাধারণকে মুক্তির পথ দেখানোর জন্যই শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতির কেন্দ্র নবদ্বীপে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হয়েছিলেন। তৎকালীন সময়ে ভগবৎ-প্রেমের নামে চলছিল ব্যাভিচার। একদিকে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের জাত্যাভিমান, পাণ্ডিত্যগর্ব ও ভগবৎ-বিমুখী বাগ্-বিতণ্ডায় বৃথা অবক্ষয়, অন্য দিকে ক্ষুদ্র ও অন্ত্যজ জাতির অতিশয় দুরবস্থা, ধর্মশাস্ত্রে অজ্ঞতা, অস্পৃশ্যতা ও ভগবৎ উপাসনায় অনধিকার, এমনকি পূজাপার্বণ, উৎসবাদি উপলক্ষেও একত্র মিলনের অযোগ্যতা। সেই সময় হিন্দু ধর্মের এই অবস্থা। উচ্চবর্ণের অত্যাচারে, নবাব বাদশার প্রভাবে, রাজানুগ্রহ লাভের আকাঙ্খায়, স্বেচ্ছায় ও দায়ে পড়ে পর ইচ্ছায়

বহুরূপে সম্মুখে তুমি : বিবেকানন্দ (১২-১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০১৪)
রাণীগঞ্জ গার্লস কলেজ, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ
ISBN : 978-93-84-491-05-5

IMPACT OF SWAMI VIVEKANANDA ON EMPOWERMENT OF INDIA WOMEN

Dr. Aparna Ghosh
Department of Philosophy, Abhedananda Mahavidyalaya, Sainthia

Now-a-days the issue of empowerment of women is a popular slogan. It has gained prominence in recent times. Many many articles, essays, reserch paper on this subject have been being published in different newspapers, magazines and jounals. It is a matter of discussion and debate in academic circles and judiciary. So first of all we should know the meaning of 'empowerment', empowerment is a process by which the most insecure person can raise voice on any issues his/her security and can fight against the social system which deprive him/her of liberty and right. It is a continuous process to achieve the objectives of equality for all, liverty and emancipation of men.

Empowerment of women is a pressing necessity. Women are human species like men and consist of all most fifty percent of the world population. No society, country, nation can develop and prosper without the all-round development of women. The great monk Swami Vivekananda had felt the necessities of progress of Indian men and women equally for the all-round development of India. In his word, "There is no chance of welfare of the world unless the conditions of women is improved. It is not possible for a bird to fly on only one wing."

Swamiji traces the downfall of India to the continued neglect of our women and of our masses, "In India there are two great evils",

Rajyosree Di

Received on 02-09-2012
Accepted on 16-12-2012

J. Interacad. 17(1) : 138–142, 2013 ISSN0971-9016

STUDIES ON PHYSICO-CHEMICAL PARAMETERS OF RURAL PONDS WATER AND SOIL OF FOUR BLOCKS OF BIRBHUM DISTRICT OF WEST BENGAL, INDIA

RAJYOSREE ROY[1], B. C .PATRA[2] AND M.MONDAL[3]

[1] Dept. of Zoology, Abhedananda Mahavidyalaya,
Sainthia, Birbhum, West Bengal, India.
[2] Dept. of Zoology, Vidyasagar University,
Midnapore, West Bengal, India.
[3] District Rural Development Cell,
Suri, Birbhum, West Bengal, India.

ABSTRACT

Ponds water and soil quality play an important role towards the productivity of an aquatic ecosystem. Scientific management of different physico-chemical parameters of water and soil are very essential for optimum production of fish on commercial basis. It may be achieved through the systematic monitoring of water and soil properties of the ecosystem of various stages. The present study was conducted with a view to assess the different physico-chemical parameters of ponds water and soil of four blocks of Birbhum district, West Bengal. The results revealed that there was seasonal variation in some of the physico-chemical parameters of water and most of these parameters were within normal range indicating good quality of water and soil.

Key words: **Pond, Physico-chemical parameters, Soil quality, Dissolved oxygen**

INTRODUCTION

The quality of water is usually mentioned according to its physical, chemical and biological parameters. Water and soil characteristics of fish ponds play an important role for its productivity i.e. output in terms of fish production. Deciding quality of water resource an adequate knowledge of existing nature of physico-chemical parameters, magnitude and source of any pollution load must be known, for which monitoring of physico-chemical parameters and pollutant is essential (Reddy *et, al.*, 1994).Water quality assessment from any region is an important aspect for the development activities of the region, because the rivers, lakes etc. are used for water supply to domestic, industrial, agriculture and fish culture use (Jain and Senapati,1996). The productivity of any fish pond depends largely on the quality of bottom mud which is the store house of nutrients. Various chemical and biochemical changes continuously take place in the underwater pond mud resulting in release of nutrients to the overlying water (Mandal and Chattopadhyay 1990). As there is no sufficient primary data about Physico-

Int. J. Bio-res. Env. Agril. Sci. 1(1): 36-38 (2015)

STUDIES ON TRACE MINERALS IN COW AND BUFFALO MILK IN RED LATERITIC ZONE OF WEST BENGAL.

M. Mondal[1], S. K. Pyne[2], G. Samanta[3] and R. Roy[4]

[1] State Poultry Farm, Kakdwip, South 24 Parganas, West Bengal, Pin 743 347.
[2] Prof. & Head, Department of ASEPAN, Institute of Agriculture, Sriniketan, Visva-Bharati, W.B.
[3] Prof. Deptt. of Animal Nutrition, W. B. Univ. of Animal & Fishery Sciences, Belgachia, Kolkata
[4] Department of Zoology, Abhedananda Mahavidyalaya, Sainthia, Birbhum, W. B, PIN 731 234.
*e-mail:sarojpyne@yahoo.com

Received: Feb. 2015 Revised accepted: March 2015

ABSTRACT

A detailed survey was carried out in four districts of Red Lateritic Agro-climatic zone of West Bengal.130 no's of cow milk and 120 no's of buffalo milk samples in the third lactation of morning milking were collected randomly from the farmer houses of the surveyed region . Trace minerals viz. copper, zinc, manganese and iron were estimated in milk by utilizing Atomic Absorption Spectro Photometer. The data revealed that trace elements in buffalo milk were higher than cow milk. Copper content in cow and buffalo milk was within the normal range whereas, most of the cow milk samples were deficient in zinc. Higher concentration of manganese and iron were found in both the cow and buffalo milk.

Keyword: Mineral elements , red lateritic zone , milk, cow, buffalo.

INTRODUCTION

Chemical composition of milk is highly variable and influenced by intrinsic factors like breed , species, stage of lactation , number of lactation , age of animal, changes in feeding, time of milking etc. The presence of minerals in milk is very important for the nutrition of human beings, particularly young ones. Minerals also play a dominant role in milk processing and product manufacture. Both iron and copper promote development of oxidized flavor in milk and milk products. They also catalyze oxidation of ascorbic acid and influence lipase activity. The present work describes the results on the concentration of copper, zinc, manganese and iron in cow and buffalo milk in red lateritic agro-climatic zone of West Bengal

MATERIALS AND METHODS

A detailed survey was carried out in the red lateritic zone of West Bengal covering four districts, namely Birbhum, Bankura, Purulia and West Midnapore. Composite morning milk samples both from cow (130 Nos.) and buffalo (120 Nos.) in the third lactation were collected randomly in the plastic containers avoiding metallic contamination from farmer houses after completion of milking. Trace minerals viz. copper, zinc, manganese and iron were determined as per the method described by Sandel (1950) and Arenza (1977). 2 ml of milk was taken in a 100 ml conical flask and added 20 ml of tri-acid mixture of concentrated H_2SO_4, HNO_3 and $HClO_4$ (9: 2: 1 v/v). Digestion carried out on hot plate at 180-200°C. Cooled digested content was transferred to a 50 ml volumetric flask by washing with triple glass distilled water through Whatman filter paper No 42. The final volume was made to 50 ml. Concentrations of trace minerals were made through the Atomic Absorbtion Spectro Photometer (Perkin Elmer A Analyst 100) using specific lamp and standard. The values are expressed in terms of ppm (parts per million.). The data was analysed as per the method described by Snedecor and Cochran, 1967 using MS Excel software package.

CHAPTER - 26

Empowerment of Women Members of Self-Help Group through Rural Pisciculture in Birbhum District of West Bengal

Rajyosree Roy[1], Mihir Mondal[2] and Debabrata Roy Gupta[3]
Department of Zoology, Abhedananda Mahavidyalaya, Sainthia, Birbhum West Bengal, India
Email: royrajyosree@gmail.com
State Poultry Farm, Kakdwip, South 24 Parganas, West Bengal, India
Livelihood Development Officer, District Rural Development Cell, Birbhum West Bengal

ABSTRACT

A detailed survey was carried out in all the 19 rural blocks of Birbhum district of West Bengal. Pisciculture is a powerful income generating activity (IGA) by the women Self Help Group (SHG) members related to poverty reductionand employment generation for a vast section of the rural society. Self Help Groups are non-formal cooperatives that are causing a silent revolution in rural India through micro credit and various other economic activities involving women are the major change agents. Nearly, thirty thousand SHGs have been formed in Birbhum district of West Bengal that had made a notable success in micro finance. This study has focused on the functioning of 38 women SHGs of Birbhum district comprising 644 members mainly belonging to Below Poverty Line family.Totally 38 SHGs have been selected for the study. Each group had a unique name and consists of about 10 to 18women members. Information was elicited from all the members of 38 women SHGs, which together formed 644 members, constituting the study sample. The data were collected with the help of semi-structured interview survey schedule. The survey was carried out during the year 2009. Different social class of these fisher women members of the

6INTERNATIONAL JOURNAL OF BIO-RESOURCE, ENVIRONMENT AND AGRICULTURAL SCIENCES (IJBEAS)
Vol. 2(1): 226-231, 2016
www.sbear.in // ISSN 2454-3551

SUSTAINABLE INCOME OF SELF-HELP GROUP MEMBERS THROUGH PISCICULTURE IN BIRBHUM DISTRICT, WEST BENGAL, INDIA

Rajyosree Roy[1], Mihir Mondal[2], Debabrata Roy Gupta [3] and Mampi Dey[1]

[1]Department of Zoology, Abhedananda Mahavidyalaya, Sainthia, Birbhum, West Bengal, India, 731234
[2]State Poultry Farm, Kakdwip, South 24 Parganas, West Bengal, India, 743347
[3]District Project Manager, Social Mobilisation & Institution Building, District Mission, Management Unit, Jalpaiguri, West Bengal

Received: February 2016 Revised accepted: March 2016

ABSTRACT

Pisciculture is an important vibrant sector provides protein, vitamins and minerals to the human beings. The present paper discussed the performance of the fishery groups and impact of earning of Self Help Groups on their households and threats related to this economic activity as well as social & economic empowerment of the women members of SHG. The study is based on primary as well as secondary data, which was collected with the help of semi-structured interview survey schedule from 19 rural blocks of Birbhum district of West Bengal. Totally 93 SHGs included 45 male, 38 female and 10 mixed SHGs respectively. SHG members practice composite fish culture/ poly culture and some of them were involved in integrating fish farming. Male SHGs increased their income in comparison to female & mixed SHGs. Family income increased per member after repayment of bank loan and other expenses. Empowerment of SHG women through training and other assistance have positive impact on the SHG members; increase in self-confidence, leadership qualities and enhanced income to improve their nutrition.

Keywords: Self-Help Groups, Pisciculture, Loan, Women Empowerment.

INTRODUCTION

Pisciculture is an important vibrant sector provides protein, vitamins and minerals to the human beings which are also utmost importance for prevention of malnutrition of the poor one. Pisciculture is also a powerful income generating activity (IGA) of the Self Help Group (SHG) members belonging to poor fishermen& women community for poverty alleviation and employment generation for a vast section of the rural society. The SHGs are mostly non-formal groups and have a common perception of need and an impulse towards collective action (Batiwala, 1994 and Satish, 2001). The SHG is an effective instrument in bringing about personal and socio-economic changes in the rural society, which help in alleviating rural poverty and generating livelihood security (Basu et al., 2014). Fishery sector contributes to nutritional security and in earning foreign exchange. Fisher men and women member of Self Help Groups play a crucial role in various piscicultural activity and fish processing work. Fish farming requires less space, time, money and has a higher feed conversion rate (Olagunju et al., 2007). India is the fourth largest producer of fish in the world and the second largest producer of inland fish. Aquaculture can benefit the livelihoods of the poor either through an improved food supply and/or through employment and increased income (Samantary et al., 2009). Micro finance is making headway in the effort for eradicating poverty and empowering women (Jayalakshmi, 1998). Empowering women needs a holistic approach to participate in decision-making in the household, community and local democratic sector and prepare women to take up leadership position in agricultural activities (Pinto, 1995 and Sabri, 1998).Self Help Groups in rural areas are causing a silent revolution through micro credit and various other activities to make the pisciculture sustainable. Fisheries is an important livelihood generations in rural areas (FAO, 2001). In this backdrop, the present study is an attempt to understand the various activities undertaken by SHG members to make pisciculture as a livelihood activity. The specific objectives of the study are:

1. To assess the performance of the fishery groups.
2. To measure the impact of Self Help Groups in fishery on household levels.
3. To understand the social and economic empowerment of the women members of SHG.

Received on 20-05-2014
Accepted on 28-06-2014

J. Interacad. 18(3) : 457–462, 2014 ISSN0971-9016

RURAL PISCICULTURE AS A LIVELIHOOD ACTIVITY FOR POVERTY ALLEVIATION BY THE WOMEN SELF HELP GROUP MEMBERS OF BIRBHUM DISTRICT, WEST BENGAL

RAJYOSREE ROY[1], M. MONDAL[2], B. C. PATRA[3] AND M. SEN[4]

[1]Dept. of Zoology, AbhedanandaMahavidyalaya,Sainthia,Birbhum,West Bengal, India,731234.
[2]State Poultry Farm, Kakdwip, South 24 Parganas. West Bengal,India.
[3]Dept. of Zoology, Vidyasagar University, Midnapore, West Bengal.
[4]State Institute of Panchayats and Rural Development, Nadia, India.

ABSTRACT

Self Help Groups are non-formal cooperatives that are causing a silent revolution in rural India through micro credit and various other economic activities involving women are the major change agents. Nearly, thirty thousands SHGs have been formed in Birbhum district of West Bengal that have made a notable success in micro finance. This study has focused on the functioning of 38 women SHGs located in rural areas of 19 blocks of Birbhum district comprising 644 members mainly belonging to Below Poverty Line family. Different social class of these fisher women members of the SHGs were assisted under Swarnjayanti Gram Swarojgar Yojana. These SHGs were found to save a portion of their meager income and pool that money for their inter-lending among them at an interest decided by the SHG. The survey revealed that credit and project loan were used for better sustainability and enhancement of income from pisciculture. Most of the cultural water bodies i.e. ponds were under lease condition. Empowerment of women was undertaken through training and other assistance given by local panchayat, NGOs and Govt. officials.The SHG members, increase in self-confidence, leadership qualities, skill to undertake pisciculture and marketing, knowledge of book keeping, enhanced income, linkage with bankand protest against social injustice.

Key words : Self Help groups, Pisciculture, Loan, Women empowerment

INTROUCTION

Rural development through pisciculture as a powerful income generating activity (IGA) by the women Self Help Group (SHG) members accounting for poverty alleviation as well as employment generation for a vast section of the rural society. The SHGs are mostly non-formal groups and have a common perception of need and an impulse towards collective action (Batiwala,1994 and Satish,2001).Fishery sector contributes to nutritional security and in earning foreign

Communicating address: C/O. J. C. Mondal (Near Hanuman Mandir) P.O. & AT. SAINTHIA, Dist. Birbhum, PIN 731 234 E. Mail mmondal64@yahoo.co.in

CHAPTER

14

Pisciculture as a Source of Sustainable Income of Self-Help Group Members in Birbhum District, West Bengal, India

Rajyosree Roy, Mihir Mondal and Debabrata Roy Gupta

INTRODUCTION

Pisciculture is an important vibrant sector that provides protein, vitamins and minerals to the human beings which are also of utmost importance for prevention of malnutrition of the poor. Pisciculture also constitutes a powerful income generating activity (IGA) of the Self Help Group (SHG) members belonging to poor fishermen & women community. This assumes great importance for poverty alleviation and employment generation for a vast section of the rural society. The SHGs are mostly non-formal groups and have a common perception of need and an impulse towards collective action (Batiwala,1994 and Satish, 2001). The SHG is an effective instrument in bringing about personal and socio-economic changes in the rural society, which help in alleviating rural poverty and generating livelihood security (Basu *et.al.*, 2014). Fishery sector contributes to nutritional security and in earning foreign exchange. Fishermen and women member of Self

Rural Pisciculture as a Sustainable Livelihood of Self-Help Group Members of Birbhum District of West Bengal, India

Rajyosree Roy, Mihir Mondal, Debabrata Roy Gupta and Mampi Dey

Abstract: Pisciculture is an important source of livelihood for resource poor farmers as well as Self Help Group (SHGs) member of West Bengal. Fish culture generating regular flow of income helps SHGs to meet their food and nutritional security. The present paper examined the performance of the fishery groups and impact of earning of Self Help Groups on their households and threats related to this economic activity as well as social & economic empowerment of the women members of SHG. The study is based on primary as well as secondary data, which was collected with the help of semi-structured interview survey schedule from 19 rural blocks of Birbhum district of West Bengal. This study has focused on the functioning of 93 SHGs of Birbhum district comprising of 1001 members belonging to Below Poverty Line families under Swarnjayanti Gram Swarojgar Yojana. Totally 93 SHGs included 45 male, 38 female and 10 mixed SHGs respectively. Focus group discussions were conducted to cross-check the collected data. The survey revealed that cash credit and project loan was used for better sustainability and enhancement of income from pisciculture. Most of the cultural water bodies i.e. ponds were under lease condition. SHG members practice composite fish culture/ poly culture and some of them were involved in integrating fish farming. Male SHGs increased their income in comparison to female & mixed SHGs. Family income increased per member after repayment of bank loan and other expenses. Empowerment of SHG women through training and other assistance have positive impact on the SHG members; increase in self-confidence, leadership qualities and enhanced income to improve their nutrition.

THE VISVA-BHARATI QUARTERLY
FOUNDED BY RABINDRANATH TAGORE
New Series Volume 23 Number 1
April 2014 - June 2014

Downtrodden 1
Song of the Journey 2
Rabindranath Tagore
Translated by *Debidas Ray*

Eradication of Malaria Through Cooperation 3
Rabindranath Tagore
Translated by *Dikshit Sinha*

Relevance of Tagore's Visva-Bharati in the Contemporary World 8
Sushanta Dattagupta
Indrani Mukhopadhyay

"I am Nobility Incarnate": Rabindranath and the Issue of Gender 24
Tapati Mukhopadhyay

Education and What It Does to Us 31
Udaya Narayana Singh

Rabindranath Tagore's Aesthetics Revisited 39
Narasingha P. Sil

Travel Modes: Rabindranath Tagore and Technology 57
Amrit Sen

Mourning and Memorializing: *baishe sravan* and After 70
Swati Ganguly

Politics of Translation: Rabindranath Tagore's *Russiar Chithi* (1930) 80
Mausumi Bhattacharjee

Documenting Trauma: Depicting the Chinese Indians in the Assamese Novel *Makum* 86
Ananda Mohan Kar
Himadri Lahiri

Attested
Teacher in charge
Mahavidyalaya

Scanned by CamScanner

ISSN 0972-043X

Published by Dr. D. Gunasekaran,
Registrar, Visva-Bharati.
and
Printed by Sri Abhijit Sengupta at Santiniketan Press,
Visva-Bharati, Santiniketan, West Bengal.
India

RUPEES ONE FIFTY ONLY

Attested
Teacher in charge
Abhedananda Mahavidyalaya
Sainthia, Birbhum

Scanned by CamScanner

Tracing the Roots of Research from Indian Perspective 102
Kapil Kumar Bhattacharyya
Biplab Loho Choudhury

Salvaging the Nation's Future: Creative Use of Literary History in Early English Writings of Bankimchandra Chatterji 117
Pritam Mukherjee

Blackness and Emasculation in Toni Morrison's *The Bluest Eye* 134
Liea Dutta

Portrayal of Urban Feminine Identity in Bengal through Aparna Sen's Lens 145
Jhuma Basak

Book Reviews 152

Note on Contributors 155

Attested
Teacher In charge
Abhedananda Mahavidyalay
Sainthia, Birbhum

Downtrodden

Rabindranath Tagore

Translated by
Debidas Ray

Oh my ill-fated land, those of yours whom you subjected to humiliation,
It's in humiliation only– you will come to be treated as equal to them.
Those of yours whom you deprived of their basic human rights,
Kept them standing and waiting in front, never offering a seat,
It's in humiliation only– you will come to be treated as equal to them.

Keeping them away as untouchable beings, day after day,
You have denigrated the God inside the human soul.
Faced with the wrath of the Lord–sitting at the doorstep of famine—
You have to share your food and drink with all of them.
It's in humiliation only– you will come to be treated as equal to them.

Down below where you pushed them away from your exalted seat
It is right there, where you casually banished all your power.
Being trampled under the feet, it mingles with the dust—
Unless you yourself come down to the same level, there is no escape.
It's in humiliation only– you will come to be treated as equal to them.

The one whom you cast down below, he will tie you down underneath,
The one whom you are keeping behind, he will pull you from the back.
Under the darkness of ignorance, the one whom you keep out of view-
casting a shadow on your well being– he creates a deep chasm between you.
Today, it is in humiliation, you will come to be treated as equal to them.

For centuries, you are carrying the burden of that shame on your head
Even then, you never bothered to pay obeisance to the God inside men.
Yet looking down below, can you not see with your own eyes
that the God of the downtrodden and poor has descended on the dust.
It is there, in humiliation you will come to be treated as equal to them.

Can you not see that the messenger of death is standing at the door?
He is putting a mark of malediction on the arrogance of your nation.
If you don't call everyone and still prefer to stay aloof,
if you tie yourself down with strings of vanity all round—

Scanned by CamScanner

06 August 2013 <http://www.slam.org.au/wp-content/uploads/2013/06/JSLaMvol6_2012_Bindlish.pdf>.

Queen's University, Department of Mathematics and Statistics. "Purva Mimamsa and Vedanta." http://www.mast.queensu.ca. August 2013 <http://www.mast.queensu.ca/~murty/ind12.pdf>.

Sanyal, Prof. J. *Guide To Indian Philosophy*. Calcutta: Sribhumi Publishing Company, 1983.

Sethy, Dr. Satya Sundar. "Indian." http://nptel.iitm.ac.in. 15 August 2013 <http://nptel.iitm.ac.in/courses/109106059/downloads/Lecture%2038.pdf>.

Sivananda, Swami. "All About Hinduism." 1999. http://www.dlshq.org/. August 2013 <http://www.dlshq.org/download/hinduismbk.htm>.

Varadachari, Dr. K.C. "Abhava And Anupalabdhi or Non – Existence and Non – perception." http://www.drkcv.org. August 2013 <http://www.drkcv.org/Books/kcv10chap_3.htm>.

Vidyabhusana, Satisa Chandra. *The Nyaya Sutras of Gotama*. Allahabad: Sudhindranatha Vasu, Panini Office, 1913.

Virupakshananda, Swami. *Samkhya Karika of Isvara Krsna with The Tattva Kaumudi of Sri Vacaspati Misra*. Madras: Sri Ramakrishna Math, 1995.

Internet Sources:

"http://prabhupadabooks.com." Prabhupada > Books > Srimad-Bhagavatam > Canto 2> SB 2.2: The Lord in the Heart > SB 2.2.27. August 2013 <http://prabhupadabooks.com/sb/2/2/27?d=1>.

"Vedanta." http://en.wikipedia.org. August 2013 <http://en.wikipedia.org/wiki/Vedanta>.

S.N.Sastri. "Brahmasutra 1.1.4." http://sanskritdocuments.org/. 06 August 2013 <http://sanskritdocuments.org/sites/snsastri/brahmasutra1.1.4.pdf>.

"Prabhupada > Books > Bhagavad-gita As It Is (1972) > Bg 5 > Bg 5.4." http://prabhupadabooks.com. August 2013 <http://prabhupadabooks.com/bg/5/4?d=1>.

Attested
Teacher In charge
Abhedananda Mahavidyalay
Sainthia, Birbhum

Salvaging the Nation's Future: Creative Use of Literary History in Early English Writings of Bankimchandra Chatterji

Pritam Mukherjee

Introduction

In the late nineteenth century, colonial Bengal witnessed the emergence of a new discipline– history of Bengali literature. Under the influence of English education, there was a sudden explosion of interest in writing history of Bengali literature. A close reading of these early histories confronts its readers with a striking set of inner tensions, conflicts and paradoxes that calls out for an in-depth analysis. The rise of history of Bengali literature as an important intellectual discipline can be placed against the general backdrop of Indian intelligentsia's early nationalist project of writing its own history. The presence of a dominant colonial model in the intellectual domain made this salvaging enterprise all the more complicated. From the very beginning of this cultural project Bengali intellectuals were engaged in creating a competing narrative to contend and contest the rules laid down by the dominant statist culture. A survey of these early attempts at a literary history of Bengal reveals how their authors resisted, challenged and expanded the official idea of a literary history. In fact, they transformed the "investigative modalities" (Cohn 5) into a re-constructionist cultural-nationalist project that gave this enterprise a counter-active role. A study of these early attempts at creating a notion of literary past in Bengal can help us relocate the gradual rise and development of cultural nationalism in Bengal. It is also a good occasion to judge the ways in which its preferences and dominant ideological positions got shaped in and through early English writings of Bankimchandra Chatterji.

Growing Importance of History

History became a highly contested academic zone where Bengal intelligentsia wished to make their presence felt by questioning and challenging the dominant imperial discourse. The urge to reconstruct India's past came with a desire to take control of the present. Right from the early days of colonial rule it was pointed out to the subject nation that it lacked a sense of history (Mill 67). Indian intelligentsia's quest for a reply to this accusation only started to take concrete shape in the second half of the

Scanned by CamScanner

ISSN: 2229-4813

VOLUME: 7-8

Spring and Autumn 2014

impressions of eternity

Journal of Language and Literature Studies

Prof. Sudeepta Banerjee Special Issue

Patron: Dr Gautam Banerjee

Editor: Dr Subhadeep Ray

Published By

The Department of English (Post Graduate and Under Graduate)

Bidhan Chandra College,

Asansol,

West Bengal, India.

Attested

Teacher In charge
Abhedananda Mahavidyalaya
Sainthia, Birbhum

Scanned by CamScanner

Works Cited

- Ashcroft Bill and Ahluwalia Pal (1999) "Edward Said". New York: Routledge
- Ashcroft Bill and Kadhim Hussain (2001) "Edward Said and the Post-Colonial". New York: Nova Science Publishers
- Bush Barbara (2006) "Imperialism and Postcolonialism". U.K: Pearson Education Ltd
- Chew Shirley and Richards David (2010) ed. "A Concise Companion to Postcolonial Literature". USA: Willey- Blackwell
- Chrisman Laura (2003) "Postcolonial Contraventions". Manchester: Manchester University Press
- Clifford James (1988) "The Predicament of Culture: Twentieth Century Ethnography, Literature and Art". Cambridge: Harvard UP
- Dodson Michael S. (2010) "*Orientalism*, Empire, and National Culture: India 1770-1880" New Delhi: Foundation Books
- Gandhi Leela (1995) "Post colonial Theory: A Critical Introduction". New Delhi: Oxford University Press
- Hutcheon Linda (2001) "*Orientalism* As Post –Imperial Witnessing" In Bill Ashcroft and Hussein Kadhim (ed.) "Edward Said and the Postcolonial", New York: Nova Science Publishers
- Loomba Ania (1998) "Colonialism/ Postcolonialism". London: Routledge
- McLeod John (2000) "Beginning Postcolonialism". Manchester: Manchester University Press
- Mongia Padmini (1997) "Contemporary Postcolonial Theory: A Reader". New Delhi: Oxford University Press
- Said Edward W. (1978) "*Orientalism*: Western Conceptions of the Orient". New York: Vintage
- ---(1985) "*Orientalism* Reconsidered", Race and Class 27(2): 1-16
- ---(1989) "Representing the Colonized: Anthropology's Interlocutors" , Critical Inquiry 15(2): 205-25
- ---(1993) "Culture and Imperialism". New York: Knopf
- Young Robert (1990) "White Mythologies: Writing History and the West". London: Routledge

Attested
Teacher In - charge
...nda Mahavidyalay
...bhum

Early Challenges in Imperial Knowledge Formation: Evidences from Francis Hamilton Buchanan's *Dinajpur* (1833)

> "We are too much accustomed to speak of India as a single country and of its inhabitants as a single nation; but the truth is, that as regards its history, its extent, and its population, India displays the diversities rather of a continent than of a single State. Our mistake arises from the customs or beliefs of particular parts being falsely predicated of the whole, and from isolated facts being magnified into general conclusions."(W. W. Hunter, *Annals* 96).

> "... 'to govern men there is but one way, and it is an eternal truth. Get into their skins. Try to realise their feelings.'"(General Gordon qtd in Ghosal,*Civil Service* 11).

William Wilson Hunter in his *The Annals of Rural Bengal* (1868) explored the geographical nature of power by identifying the reach and the limits of the imperial language that had emanated from the colonial authority. In his book, Hunter had rightly pointed out that the control of this imperial language confronts a unique barrier towards the periphery of Empire where it becomes disorderly and chaotic. As a result of this, the iron grip of the centre evaporates in those remote areas leaving behind uncomfortable questions and doubts. From a very early date, British colonial authority in India had put in place efforts to bring into cognisance far-off places that lie at the periphery of the empire so that it could establish stability and order in the entire occupied region. One way of doing that was to create an information network system that would effectively dispel any sense of mystery surrounding the place and its people. Hunter's *The Annals of Rural Bengal* is a classic example of such an enterprise that aspired to illuminate an area, which had not yet been assimilated in the imperial knowledge system. Bernard Cohn had rightly described various ways in which this process of imperial knowledge formation worked as "investigative modalities" (Cohn, *Colonialism* 11 – 15). The ultimate aim of these 'Modalities' was to enter into the consciousness the colonized ['to get into the skins']. Constant and continuous efforts of the British were to acquire an intimate knowledge of India. However, what Cohn perhaps sadly missed was the fact that tension and anxiety are two dominant motifs that characterize the imperial language in which this episteme of Empire had been written. Laura Ann Stoler has described these uncertainties, in a slightly different context though, as "epistemic anxiety" (Stoler, *Archival* 19). She was correct in revealing this unique tension in the colonial

THE VISVA-BHARATI QUARTERLY
FOUNDED BY RABINDRANATH TAGORE
New Series Volume 24 Number 4
January 2016 - March 2016

Rabindranath Tagore
Translated by: *Sushmita Ray*
A Cock and Bull Story 1

Translated by: *Debidas Ray*
A Chance-Meeting 9
Manasi 11

Binodini
Sri Bhavana 13

Bimbisar Irom
Binodini's Sri Bhavana: A Prefatory Essay 21

Tapati Mukherjee
Inter-Disciplinary Studies: Indian Perspectives 27

Amrit Sen
Nationalism, Environment and Rural Reconstruction in Rabindranath Tagore's Idea of the Festival 33

Sujit Kumar Paul
Tagore's Experiment on Rural Reconstruction: A Study On Present Intervention 55

Sarani Ghosal Mondal
The "Kings" in Tagore's *The King of the Dark Chamber and Red Oleanders:* An Aurobindonian Approach 69

Pritam Mukherjee
A New Concept of Empire: William Wilson Hunter and the Rhetoric of 'Improvement' in Colonial Bengal 81

Attested
Teacher In charge
Abhedananda Mahavidyalay
Sainthia, Birbhum

Scanned by CamScanner

ınd Sobel, Prem. The *Hierarchy of Minds: Selection from the Works of Sri Aurobindo and The ther*, Puducherry: Sri Aurobindo Ashram, 1984. Print.

ni, Krishna.*Tagore: A Life*. New Delhi: National Book Trust, 1886. Print.

ıanda. Introd and Trans. *Rabindranath Tagore: Three Plays*. New Delhi: OUP, 2001. Print.

. *The Adventure of Consciousness*, Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram, 1968. Print.

kumar. *History of Bengali Literature*. New Delhi: Sahitya Akademi, 1960. Print.

Purohit Shri. *The Geetâ: The Gospel of the Lord Shri Krishna*, with a Preface by Sir RâoGaekwâr, London: Faber and Faber Limited, 1935. Print.

n, Edward. *Rabindranath Tagore: Poet and Dramatist*, Calcutta: RDDHI-INDIA, 1948. Print.

g of the Dark Chamber", [http://shodhganga.inflibnet.ac.in:8080/jspui/bitstream/10603/33371/hapter%204.pdf]

Attested
Teacher In charge
Abhedananda Mahavidyalay
Sainthia, Birbhum

Pritam Mukherjee

A New Concept of Empire: William Wilson Hunter and the Rhetoric of 'Improvement' in Colonial Bengal

The essay is about William Wilson Hunter's view of imperial governance. Hunter as one of the chief policymakers of Lord Mayo's colonial regime, had played a pivotal role in shaping and giving direction to the newly emerging 'improvement' rhetoric in late-nineteenth century colonial Bengal. Introduction of this new rhetoric had a curious impact on the emerging nationalist culture of Bengal; thus it is important to investigate Hunter's part in this crucial phase of history. Hunter was an eminent member of the Indian Civil Service, a historian, statistician and imperial publicist. He had an extraordinary range of intellectual interests that covered diverse fields of study, including history, literature, geography, demography, identity politics, lexicography, statistics, and so on. Hunter was one of the handful of imperial officers who could be said to have encouraged the process of gradual rationalization and modernisation of the institutions of the colonial state. The nature and scale of his involvement in the processes of change remain critical also for the fact that he had always maintained and valued an intimate relationship with the Bengali intelligentsia of his time. It won't be an exaggeration to say that his life and work were linked to the inner dynamics of Empire in such a way that to understand his vast body of work is to understand a good deal about the changing nature of imperial governance too. The main aim of this paper is to locate the challenges of William Wilson Hunter's influential body of works in the context of his role in the formation of a new mode of imperial governance in Bengal in the late nineteenth century. The vitality of Hunter's various books lies in the fact that they bring us face to face with the rise of modernity in Bengal. As a result of his close engagement with the processes of change Hunter's books continue to enjoy a very interesting position till today in Bengal.

Hunter and his Admirers

However, the Bengal that Hunter had witnessed and so minutely documented is not the Bengal of today. During the political independence of India in 1947, Bengal got divided into two parts. So when in the 1990s West Bengal District Gazetteers Department, a government organisation, started reprinting parts of Hunter's *A Statistical Account of Bengal* under the same series title, one cannot but see the irony involved with this publication. In his prefatory essay to the

Scanned by CamScanner

অ নু ষ্টু প

সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা

প্রাক্ শারদীয় বিশেষ সংখ্যা

ভারতীয় উপমহাদেশে ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির মানচিত্র

৫২তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ২০১৮

প ত্রি কা র ক থা

স ম্পা দ কী য়

প্র বে শি কা

অনুপ মতিলাল ও সৌমিত্রশংকর সেনগুপ্ত

বাংলার মুঘল শাসনতন্ত্রের শেষ অধ্যায়

সিয়ার-উল-মুতাখিরীন, ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও বাংলার
মুঘল শাসনতন্ত্রের শেষ অধ্যায়: সুদীপ্ত সেন/৩

প্রশাসনিক তথ্যসংগ্রহ: সংগঠিত উদ্যোগের পর্ব

প্রসঙ্গ: প্রশাসনিক তথ্য সংগ্রহ: রমেন্দ্রনারায়ণ নাগ/১৯
জেমস রেনেল ও বাংলার মানচিত্র: কল্যাণ রুদ্র/৪৪
ভারতের বৃহৎ ত্রিকোণমিতিক সমীক্ষা, একটি ঐতিহাসিক রূপরেখা: রমা দেবরায়/৫২
ব্রিটিশ ভারতের গেজেটিয়ার প্রবাহ: অর্ধেন্দু সেন/৬১
ভূমিরাজস্ব রেকর্ডসের মায়াদর্পণ ও ঔপনিবেশিক ভারতের আদি পরিচিতি
অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়/৭৭
অভিযাত্রী ফ্রান্সিস বুকানন হ্যামিল্টন: মলয়শঙ্কর ভট্টাচার্য্য/৮৫
উইলিয়াম উইলসন হান্টারের তথ্যের জগৎ: প্রীতম মুখার্জি/১৩৩
প্রসঙ্গ, গেজেটিয়ার: শুক্তিসিতা/১৪৩
ঔপনিবেশিক শক্তি ও ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের জনজাতি সমাজ: শর্মিষ্ঠা দে/১৫৯

চর্চার বহুমুখিনতা

হারবার্ট হোপ রিসলে, জাতিতত্ত্ব, উৎপত্তি ও পরিণাম: শুচিব্রত সেন/১৭৩
কোম্পানি যুগে ভারতে বিজ্ঞানচর্চা: বিমান নাথ/১৮৯

Scanned by CamScanner

উইলিয়াম উইলসন হান্টারের তথ্যের জগৎ

প্রীতম মুখার্জি

'ভারত' বিশেষজ্ঞ হিসেবে উইলিয়াম উইলসন হান্টারের চমকপ্রদ উত্থান সূচিত হয় ১৮৬৮ সালে তাঁর *অ্যানালস্ ওভ্ রুরাল বেঙ্গল* গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে চার্লস ডারউইন—তৎকালীন প্রবন্ধ কিংবা গ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে হান্টারের গ্রন্থের যে পাঠক-সমাজের হদিশ পাওয়া যায় তা রীতিমতো ঈর্ষণীয়। তাঁর কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ বড়োলাট মেয়ো ১৮৬৯ সালে তাঁকে *ডাইরেক্টর জেনেরাল ওভ্ স্ট্যাটিস্টিক্স* পদে নিয়োগ করেন। সরকারি মহলে হান্টারের এমন দ্রুত ও অভাবিত পদোন্নতিতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল। পুরাতন ব্রিটিশ রাজপুরুষদের মধ্যে যারা ভারত-জ্ঞান-যশ-প্রার্থী ছিলেন, তাঁদের বিরূপ আচরণের একটা আভাস পাওয়া যায়, স্ক্রাইন বর্ণিত হান্টারের জীবনী গ্রন্থে। কিন্তু তার অকাট্য প্রমাণ মেলে বহুদিন বাদে খুঁজে পাওয়া জন বীমসের স্মৃতিকথায়—*মেমোয়ারস ওভ্ এ বেঙ্গল সিভিলিয়ান* (১৯৬১)। স্মৃতিকথাটির পাণ্ডুলিপি বীমসের মৃত্যুর বহুকাল বাদে আবিষ্কৃত হয় এবং ১৯৬১ সালে সাধারণ পাঠকসমক্ষে প্রকাশিত হয়। স্মৃতিকথায় বীম্‌স বেশ কিছু অনুদার ও তির্যক মন্তব্য হান্টার সম্বন্ধে করেছেন। সময়টা ১৮৬১-৭০ সাল নাগাদ, জন বীম্‌স তখন ওড়িশার বালাসোরের ম্যাজিস্ট্রেট। অপরদিকে হান্টার *অ্যানাল্‌স ওভ্ রুরাল বেঙ্গল*-এর দ্বিতীয় ভাগ—*ওড়িশা* লিখতে ব্যস্ত। এই নতুন বই সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে হান্টার ওড়িশার বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ক্ষেত্রসমীক্ষা করছিলেন। এই সমীক্ষার প্রয়োজনেই হান্টার বীমসের দ্বারস্থ হন। স্থান কটক। বীম্‌স-হান্টারের সাক্ষাৎকারের সেই স্মৃতি ধরা আছে বীম্‌সের একক বয়ানে।

> বীম্‌সের স্মৃতিকথায় হান্টার ... প্রাণবন্ত, উচ্ছল কিন্তু সম্পূর্ণ নির্ভুল বা যথার্থ লেখক নন। এতদসত্ত্বেও হান্টারের অবিরাম প্রশ্নবাণে তিনি যে ক্লান্ত ও বিদ্ধস্ত হয়েছিলেন বিরক্ত বীমস তাও উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে লেখার গুণে হান্টার বড়জোর সাংবাদিকসুলভ। সংগৃহীত তথ্য ও সংখ্যার যে ব্যবহার

Scanned by CamScanner

অনুষ্টুপ

ভারতীয় উপমহাদেশে ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির মানচিত্র

৫২ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা প্রাক-শারদীয় বিশেষ সংখ্যা ২০১৮

Scanned by CamScanner

৬২. সূত্র ঐ, p. 520-31।
৬৩. সূত্র ঐ, p. 600।
৬৪. সূত্র সারণি, F. B. Hamilton, *A Geographical, Statistical and Historical Description of the District, or, Zilla of Dinajpur, in the Province, or Soubah, of Bengal*, 1833.
৬৫. F. B. Hamilton, Purniya, p. 558.
৬৬. F. B. Hamilton, সূত্র ঐ p. 560।
৬৭. F. W. Strong, পূর্বোল্লিখিত, p. 81।
৬৮. F. B. Hamilton, Puraniya, p. 571।

উইলিয়াম উইলসন হান্টারের তথ্যের জগৎ

প্রীতম মুখার্জি

'ভারত' বিশেষজ্ঞ হিসেবে উইলিয়াম উইলসন হান্টারের চমকপ্রদ উত্থান সূচিত হয় ১৮৬৮ সালে তাঁর *অ্যানালস্ ওভ্ রুরাল বেঙ্গল* গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে চার্লস ডারউইন—তৎকালীন প্রবন্ধ কিংবা গ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে হান্টারের গ্রন্থের যে পাঠক-সমাজের হদিশ পাওয়া যায় তা রীতিমতো ঈর্ষণীয়। তাঁর কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ বড়োলাট মেয়ো ১৮৬৯ সালে তাঁকে *ডাইরেক্টর জেনেরাল ওভ্ স্ট্যাটিস্টিক্স* পদে নিয়োগ করেন। সরকারি মহলে হান্টারের এমন দ্রুত ও অভাবিত পদোন্নতিতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল। পুরাতন ব্রিটিশ রাজপুরুষদের মধ্যে যারা ভারত-জ্ঞান-যশ-প্রার্থী ছিলেন, তাঁদের বিরূপ আচরণের একটা আভাস পাওয়া যায়, স্ক্রাইন বর্ণিত হান্টারের জীবনী গ্রন্থে। কিন্তু তার অকাট্য প্রমাণ মেলে বহুদিন বাদে খুঁজে পাওয়া জন বীমসের স্মৃতিকথায়—*মেমোয়ারস ওভ্ এ বেঙ্গল সিভিলিয়ান* (১৯৬১)। স্মৃতিকথাটির পাণ্ডুলিপি বীমসের মৃত্যুর বহুকাল বাদে আবিষ্কৃত হয় এবং ১৯৬১ সালে সাধারণ পাঠকসমক্ষে প্রকাশিত হয়। স্মৃতিকথায় বীম্‌স বেশ কিছু অনুদার ও তির্যক মন্তব্য হান্টার সম্বন্ধে করেছেন। সময়টা ১৮৬১-৭০ সাল নাগাদ, জন বীম্‌স তখন ওড়িশার বালাসোরের ম্যাজিস্ট্রেট। অপরদিকে হান্টার *অ্যানাল্‌স ওভ্ রুরাল বেঙ্গল*-এর দ্বিতীয় ভাগ—*ওড়িশা* লিখতে ব্যস্ত। এই নতুন বই সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে হান্টার ওড়িশার বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ক্ষেত্রসমীক্ষা করছিলেন। এই সমীক্ষার প্রয়োজনেই হান্টার বীমসের দ্বারস্থ হন। স্থান কটক। বীম্‌স-হান্টারের সাক্ষাৎকারের সেই স্মৃতি ধরা আছে বীম্‌সের একক বয়ানে।

> বীম্‌সের স্মৃতিকথায় হান্টার ... প্রাণবন্ত, উচ্ছল কিন্তু সম্পূর্ণ নির্ভুল বা যথার্থ লেখক নন। এতদসত্ত্বেও হান্টারের অবিরাম প্রশ্নবাণে তিনি যে ক্লান্ত ও বিদ্ধস্ত হয়েছিলেন বিরক্ত বীমস তাও উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে লেখার গুণে হান্টার বড়জোর সাংবাদিকসুলভ। সংগৃহীত তথ্য ও সংখ্যার যে ব্যবহার

Scanned by CamScanner